দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

সংবিধানের ৩৭০ ধারার সঙ্গে ৩৫-এ ধারাকেও বিদায় জানানো উচিত
পৃঃ ১৪

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে মিত্র দেশের সন্ধান ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ— দুটোই করে চলেছে মোদী সরকার — পৃঃ ১২

৭০ বর্ষ, ১০ সংখ্যা।। ৩০ অক্টোবর ২০১৭।। ১২ কার্তিক - ১৪২৪।। যুগাব্দ ৫১১৯।। website : www.eswastika.com ।।

রাহুলের বালখিল্যপনা

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭০ বর্ষ ১০ সংখ্যা, ১২ কার্তিক, ১৪২৪ বঙ্গাব্দ

৩০ অক্টোবর - ২০১৭, যুগাব্দ - ৫১১৯,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ / ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2016-18

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক রণেন্দ্রলাল ব্যানার্জী কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

দার্জিলিং-এর সাম্প্রতিক অশান্তি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ কমল মুখোপাধ্যায় ▯ ৯

সংবিধান প্রদত্ত মত প্রকাশের অধিকার পশ্চিমবঙ্গে নেই ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : বিজেপি যেন বাঘ-মামা ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে মিত্রদেশের সন্ধান ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ— দুটোই করে চলেছে মোদী সরকার ▯ ড. নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত ▯ ১২

সংবিধানের ৩৭০ ধারার সঙ্গে ৩৫-এ ধারাকেও বিদায় জানানো উচিত ▯ ধর্মানন্দ দেব ▯ ১৪

ভারতীয় রেল নিয়ে বিভ্রান্তিকর নেগেটিভ প্রচার ও তার ভবিষ্যৎ ▯ সঞ্জয় কুমার দাস ▯ ১৭

রাহুল আগে বড় হন তারপর রাজনীতি করবেন ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত ▯ ১৯

রাহুল বচনামৃত ▯ সোহম মিত্র ▯ ২১

রাহুল এখন আমজনতার হাসির খোরাক ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ২২

মানুষ যখন অত্যাচারিত তখন ভিজিল্যান্টিদের আবির্ভাব ঘটে ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ২৭

কাণ্ডারীয় মহাদেব হিন্দু অস্মিতার এক প্রতীক ▯ সৌমেন নিয়োগী ▯ ৩১

বারুইপুরে রাসমেলা ▯ সপ্তর্ষি ঘোষ ▯ ৩৩

দ্রিঘাংচুর ভূয়োদর্শন : বিশ্ববাংলায় বিশ্ব ফুটবল ▯ ৩৫

নিয়মিত বিভাগ

এইসময়, সমাবেশ সমাচার : ২৪-২৬ ▯ চিঠিপত্র : ২৯-৩০ ▯ অঙ্গনা : ৩৪ ▯ সুস্বাস্থ্য : ৩৭ ▯ খেলা : ৩৮ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ চিত্রকথা ও শব্দরূপ : ৪২

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শতবর্ষে বসু বিজ্ঞান মন্দির

দেশের বিজ্ঞান সাধনায় বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অবদান অনস্বীকার্য। বরেণ্য বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত বসু বিজ্ঞান মন্দির এবছর শতবর্ষ পূর্ণ করল। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে স্বনামধন্য এই বিজ্ঞান-মন্দির নিয়ে আলোচনা।

লিখেছেন— বিশ্বজিৎ মণ্ডল এবং নির্মল মাইতি।

।। দাম একই থাকছে : দশ টাকা।।

হকার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ স্বস্তিকার জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন—

বিশাল বুক সেন্টার

৪, টটি লেন
কলকাতা-৭০০০১৬

ফোন ঃ
(০৩৩) ৪০৬৪৪১০৩
৪০৬৪৪০৯৭

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

কুক্ষিগত 'ইতিহাস'

প্রতিটি জাতির ইতিহাসের স্বতন্ত্র গতিপথ রহিয়াছে। ইতিহাস হইতে জাতিসত্তার উপাদান অনুসন্ধানের প্রয়াস প্রত্যেকটি জাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। যে জাতির ইতিহাসে বর্বর সত্তা লুকাইয়া রহিয়াছে তাহারাও তাহার মধ্যে বীরত্ব খুঁজিয়া লয়। ভারতবর্ষে 'ইতিহাস'-এর ধারা কিঞ্চিৎ ভিন্ন। তাহার অতীত গৌরবোজ্জ্বলতা এহেন 'ইতিহাস'-এ অন্ধকারময় যুগ হিসাবে শোভা পায়। অন্য দিকে ভারতবর্ষের বহিরাগত সম্পদ-লুটেরাদের 'বীরত্বের কাহিনি' সেই ইতিহাস ভরাইয়া রাখে। এই 'ইতিহাস' রচনার কৃতিত্ব কেবল বিদেশিদের দিয়া লাভ নাই। বিদেশিরা সুযোগ পাইলে অন্যকে হেয় করিবে, শাসনক্ষমতা কুক্ষিগত করিবার লক্ষ্যে ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাইবে ইহা স্বাভাবিক।

এক্ষেত্রে দেশের মানুষের কিছু কর্তব্য ছিল। প্রাক্-স্বাধীনতা আমলে ও তাহার পরেও কিছুদিন ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ তাঁহাদের কর্তব্য যথাযথ পালনের প্রয়াস করিয়াছেন। স্বাধীন দেশের শাসক বুঝিয়াছিল ইহাতে সমুদয় বিপদ। ব্রিটিশ দেশ ছাড়িলেও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে তাহাদের বকলমে একটি 'শাসকশ্রেণী'র সৃষ্টি করিয়াছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামে যাহাদের কানাকড়িও অবদান ছিল না। ব্রিটিশ-প্রভুদের গোলাম এই শাসকশ্রেণী বুঝিল বিদেশিদের রচিত 'ইতিহাস'-এর টনিক দেশবাসীকে আর অধিকদিন গেলানো যাইবে না। সুতরাং দেশবাসীকে বিপথে চালিত করিতে কিছু 'দেশীয় ঐতিহাসিক' প্রয়োজন।

বিদেশি ভাবধারা এদেশে আমদানি করিতে মার্কস-লেনিনের মানসপুত্রেরা ছিল তাহাদের বড় ভরসা। মাও-জে-দং ছিল তাহাদের আদর্শ। আর এই 'দেশবিরোধী বিকৃত ইতিহাস'-এর সূতিকাগার হিসাবে জন্ম হইল একটি সার্থক-নামা প্রতিষ্ঠানের—'জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়' বা জে এন ইউ। রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিব, সুমিত সরকার, বিপান চন্দ্র—সুকুমারমতি ছাত্রছাত্রীদের মগজ ধোলাইয়ের এমনই কতশত নাম যে বিগত কয়েক দশকে ঘোরাফেরা করিয়াছে দেশজুড়ে তাহার ইয়ত্তা নাই, যাহাদের 'ইতিহাসবিদ' পরিচয় ভেক মাত্র, ইঁহারা নিছক 'পার্টি-ক্যাডার'-এর অধিক কিছু নন।

ফলত আমাদের ইতিহাস এখন কমিউনিস্ট পার্টির কুক্ষিগত ইতিহাস। দেশ স্বাধীন হইবার পূর্বে ও পরবর্তীতে দেশবাসীর সঙ্গে যাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা নজির সৃষ্টি করিবার মতো, সেই চরম দেশদ্রোহীদের হাতে পড়িয়া আমাদের প্রকৃত ইতিহাস লাঞ্ছিত হইয়াছে। সাম্প্রতিক তাজমহল হইতে টিপু-বিতর্কের সৃষ্টির মূলে ইহাদের অবদান কম নয়। জাতপাত, ধর্মের বিভাজন, আঞ্চলিকতা, বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্রপন্থা ইত্যাদির মাধ্যমে ভারতবর্ষকে পঙ্গু করিয়া রাখিতে ইহারা সদাই তৎপর। দলিতদের পদদলিত ইহারাই করিয়াছে। দেশবাসীকে ইহারা কীভাবে বিভ্রান্ত করিতেছে তাহার একটি দৃষ্টান্ত হইল ফেসবুকে অর্গানাইজারে প্রকাশিত শ্রীগুরুজী অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক মাধব সদাশিব গোলওয়ালকারের বাণী বলিয়া একটি তথাকথিত 'শূদ্র'-বিরোধী মন্তব্যের প্রচার।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-বিরোধী অপপ্রচারের তাড়নায় তাহারা ভুলিয়াছে 'অর্গানাইজার' ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়। তবে শ্রীগুরুজীর মূল ইংরাজি বয়ানটি কোথায়? কত পৃষ্ঠায় প্রকাশিত? ইহার জবাব কে দিবে? কু-চক্রীরা দিবে না। কারণ তাহাদের মিথ্যা আর কল্পনার রঙ ধরা পড়িয়া যাইবে যে। সুতরাং কমিউনিজম নামক ভাইরাস আক্রান্ত রঙিন চশমা পরিয়া ইতিহাস পড়িবার দিন শেষ হওয়া দরকার। ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস দেশভক্তদের দ্বারাই রচিত হইবে; সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলিবার জমানায়।

সুভাষিতম্

ধন্যাস্তে ভারতে বর্ষে জায়ন্তে যে নরোত্তমাঃ।

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রাপ্নুবন্তি মহাফলম্।। (বিষ্ণুপুরাণ-২৭/৭২)

যে সব শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এই ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করেছেন তাঁরা ধন্য। তাঁরা ধর্মার্থকামমোক্ষ দ্বারা মহাফল প্রাপ্ত হন।

জৈব কৃষিকর্মে গোমূত্রের উপকারিতা অনুসন্ধানে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ভারতে কৃষি গবেষণার নামি প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অব্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (আই সি এ আর)-কে গোমূত্র (বিসন বেনাসাম এল) জৈব কৃষিকাজে কতটা সহায়ক হতে পারে, সে সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দিল নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই বহুবার নিতি আয়োগের সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহের একত্রে বসার কথা বলেছেন। কারণ বিহারে জৈব কৃষিকর্মের ক্ষেত্রে শ্রী সিংহের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে এবং তাঁর অভিজ্ঞতাকে দেশবাসীর ঘরে ঘরে পৌঁছে

নিতি (দ্য ন্যাশনাল ইন্সটিটিউশান ফর ট্রান্সফর্মিং ইন্ডিয়া) আয়োগ। এর রিপোর্ট আগামী দু'মাসের মধ্যে জমা দিতে হবে নিতি আয়োগকে। সম্প্রতি নিতি আয়োগের এক জরুরি বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিংহ গোমূত্র, জৈব বর্জ্য ও গোবরকে কীভাবে জৈব কৃষিকাজে ব্যবহার করা যেতে পারে, সে বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।

গবেষণাকারী সংস্থা আই সি এ আর সূত্রের খবর তাঁদের গবেষকরা গোমূত্রের অ্যামাইনো অ্যাসিডে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন, যা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রাকৃতিক সার হিসাবে কাজ করবে। মাটি ও গাছের স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রেও অ্যামাইনো অ্যাসিডের উপকারিতা রয়েছে বলে তাঁরা মনে করছেন। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী দিতে চান প্রধানমন্ত্রী। ২০১৬ সালে সিকিম পুরোপুরি জৈব কৃষিকার্য ভিত্তিক রাজ্যে পরিণত হয়, যেখানে গোবর ও গোমূত্রকে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করা শুরু হয়।

কৃষিবিজ্ঞানীরা মনে করেন রাসায়নিক সারের সাহায্যে কৃষিকাজের কুফল এখন ভারতীয় কৃষকসমাজ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। জৈব কৃষিকর্মে যেহেতু রাসায়নিক কীটনাশক বা সারের কোনো সম্পর্ক নেই তাই পরিবেশের ভারসাম্য ও জৈব তন্ত্র নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে। শুধু তাই নয়, মাটির গুণগত মানের পরিবর্তনেও জৈব কৃষিকর্ম সহায়ক। জৈব প্রযুক্তিতে উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ এই মুহূর্তে দেশে ১ লক্ষ ২৪ হাজার মেট্রিক টন। এর মধ্যে ৮০ হাজার মেট্রিক টনই আসে সিকিম থেকে।

আই সি এ আর সূত্রে দাবি জৈব কৃষির ক্ষেত্রে গোমূত্রের প্রয়োজনীয়তা সবচেয়ে বেশি। কারণ একদিকে গোমূত্র যেমন মাটির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়, অন্যদিকে কীটনাশকেরও কাজ করে। সবচেয়ে সুবিধা, এর দামও কম। ফলে গরিব কৃষকও তা অনায়াসে ব্যবহার করতে পারেন।

এ বছরের আগস্টে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সংসদীয় কমিটি তাদের এক রিপোর্টে উল্লেখ করে যে ভারতে বিশ্বের যে-কোনো দেশের তুলনায় অন্তত সাড়ে ৬ লক্ষ বেশি জৈব উৎপাদক রয়েছে। তা সঠিক ভাবে ব্যবহার করলে অন্তত ৩০ শতাংশ কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। সিকিম ছাড়াও ভারতের ন'টি রাজ্য যেমন কর্ণাটক, মিজোরাম, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে জৈব কৃষিনীতি বা আইন রয়েছে। মজার কথা হলো, কমিউনিস্ট শাসিত কেরল একশ শতাংশ জৈবকৃষি প্রযুক্তি গ্রহণের কথা জানিয়েছে। প্রসঙ্গত, দিল্লির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ টেকনোলজি (আই আই টি) বিভিন্ন গবেষণা-প্রতিষ্ঠান থেকে ইতিমধ্যে অন্তত পঞ্চাশটি প্রস্তাব পেয়েছে 'সায়েন্টিফিক ভ্যালিডেশন অ্যান্ড রিসার্চ অন পঞ্চগব্য' প্রকল্পে দুধ ও গোমূত্রের উপকারিতা বিষয়ে গবেষণা করবার জন্য।

ইতিপূর্বে কেন্দ্রের তরফে পরিবেশ ও বনমন্ত্রী ডাঃ হর্ষবর্ধনের নেতৃত্বে রোগ নিরাময় ইত্যাদি বিষয়ে ভারতীয় গোরুর মূত্র ও গোবরের উপকারিতা নির্ধারণের জন্য একটি প্যানেল গঠন করা হয়েছিল। আগামী মাসে এর বৈঠকে এ নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের সূচনা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। রাজনৈতিক মহল অবশ্য মনে করছেন কেন্দ্রের এই উদ্যোগে সবচেয়ে বড় বাধা রাজনীতিই। যে রাজনীতি গোরুর উপাকারিতাকে অস্বীকার করে ধর্মের কারণে গো-বধে অবাধ আনন্দ পায়।

সংবাদমাধ্যমের সমীক্ষা

গুজরাট-হিমাচলে বিজেপি অনেকটাই এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ গুজরাট এবং হিমাচল প্রদেশে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কোন দল জিতবে? সম্প্রতি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে ইংরেজি সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে এবং অ্যাক্সিসের উদ্যোগে একটি সমীক্ষা করা হয়েছে। দুটি রাজ্যেই বিজেপি কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধী দলগুলিকে অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছে। বিজেপি অন্তত ১০ শতাংশ ভোটে এগিয়ে রয়েছে বলে সমীক্ষায় প্রকাশ।

কংগ্রেস শাসিত হিমাচল প্রদেশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ৪৩ থেকে ৪৭টি আসন পেতে পারে। কংগ্রেস পেতে পারে ২১-২৫টি আসন। হিমাচল বিধানসভার মোট আসন ৬৮। নভেম্বরের ৮ তারিখে হিমাচলে ভোট হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। অন্যদিকে গুজরাটে দুই পর্যায়ে ভোট হবে ডিসেম্বরের ৯ এবং ১৪ তারিখে। নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, গুজরাটে প্রথম পর্যায়ে ৮৯টি নির্বাচনী ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ করা হবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৯৩টি ক্ষেত্রে। ভোট গণনার দিন ১৮ ডিসেম্বর।

রাজনৈতিক দিক থেকে অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ গুজরাটের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি ১১৫-১২৫টি আসন পেতে পারে বলে সমীক্ষাসূত্রে জানা গেছে। কংগ্রেসের আসনসংখ্যা ৫৭ থেকে ৬৫-র মধ্যে থাকবে বলে অনুমান। সমীক্ষকেরা জানিয়েছেন বিজেপি গুজরাটে ৪৮ শতাংশ ভোট পেতে পারে। কংগ্রেস পেতে পারে ৩৮ শতাংশ ভোট। সমীক্ষার ঘোষিত ফলাফলে সব থেকে নিরাশ হবেন হার্দিক প্যাটেল। কারণ এবারের নির্বাচনে তিনি সম্ভবত একটি আসনও পাবেন না।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রতি গুজরাটের মানুষের সমর্থন উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। ৬৬ শতাংশ মানুষ জানিয়েছেন, মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় গুজরাট নানা দিক থেকে উপকৃত হয়েছে। সব মিলিয়ে দুটি রাজ্যেই বিজেপির ছবিটা বেশ উজ্জ্বল।

কেন্দ্র এবং এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে ৩০০০ কোটি ডলার

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রায়ই বলেন কেন্দ্রীয় সরকারের (পড়ুন নরেন্দ্র মোদীর) বিমাতৃসুলভ আচরণের জন্য নাকি পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন হচ্ছে না! অথচ ঘটনা ঘটছে ঠিক তার উল্টো। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক থেকে ৩০০০ কোটি ডলার ঋণ নিয়েছে। এই অর্থ পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক এবং রাজস্ব সংক্রান্ত পরিকাঠামো গড়ে তুলতে ব্যয় করা হবে বলে জানা গেছে।

কেন্দ্র এবং রাজ্যের অর্থমন্ত্রক বেশ কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যার উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গের সরকারি পরিষেবা ক্ষেত্রগুলিকে আরও উন্নত করা। এই প্রকল্পে রয়েছে সরকারি বিনিয়োগ আরও বাড়ানো, অন্যায্য খরচ কমানো এবং আদায়কৃত রাজস্বের একটা অংশ সঞ্চয় করার মতো কর্মসূচি।

অর্থমন্ত্রকের যুগ্মসচিব সমীর খারে বলেন, 'এই প্রকল্পে সরকারি অর্থ ন্যায়সঙ্গত ভাবে খরচ করার একটি পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। সেই সঙ্গে আমাদের লক্ষ্য, রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি আরও উন্নত করা এবং পর্যাপ্ত বেসরকারি বিনিয়োগ যাতে রাজ্যে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করা।' যুগ্মসচিবের বক্তব্য সমর্থন করে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের অন্যতম ডিরেক্টর কেনচি ইয়েকোয়ামা বলেন, 'এই কর্মসূচির লক্ষ্য এই রাজ্যে অর্থনৈতিক পরিসর তৈরি করা। যা বেসরকারি বিনিয়োগকারীকে উৎসাহিত করবে এই রাজ্যে বিনিয়োগ করার জন্য।'

ঘানির সঙ্গে মোদীর বৈঠক

ভারত-আফগান মৈত্রীতে নতুন বাঁক

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সম্প্রতি আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসরাফ ঘানির সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক হয়ে গেল। ওই বৈঠকে আফগানিস্তানের উন্নয়নে ভারতের ভূমিকা অদূর ভবিষ্যতে কী হতে পারে সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। দুই রাষ্ট্রনেতা সংশ্লিষ্ট দুটি দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং স্থিতিশীলতা নিয়ে আলোচনা করেন। স্বাভাবিক ভাবেই আলোচনায় উঠে এসেছিল আফগানিস্তানে ঘটে চলা সন্ত্রাসবাদের প্রসঙ্গটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আফগান রাষ্ট্রপ্রধানকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর আফগান প্রেসিডেন্ট ভারতের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে স্বাগত জানিয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতি বলেন, কঠিন সময়ে আসরাফ ঘানি আফগানিস্তানকে সুযোগ্য নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সেই সঙ্গে ভারত-আফগান সম্পর্কের ভিত্তি রচনায় তাঁর ভূমিকার কথা রাষ্ট্রপতি উল্লেখ করেন।

রামনাথ কোবিন্দ বলেন, ভারত এবং আফগানিস্তানের বন্ধুত্ব শুধুমাত্র সামরিক বা বৈদেশিক কারণবশত নয়। দুটি দেশ একে অপরকে ভালোবাসতে জানে। ২০১৬ সালে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত এশিয়া সামিটে আসরাফ ঘানির বক্তৃতার কথা উল্লেখ করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। তিনি আরও বলেন, এই বন্ধুত্বের শেকড় রয়ে গেছে দুই দেশের প্রাচীন সভ্যতায় এবং মানুষে মানুষে সম্পর্কে।

স্বস্তিকা দপ্তরে সাড়ম্বরে কালীপুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি।। প্রতিবারের মতো এবারেও স্বস্তিকার দপ্তরে কালীপুজো হয়ে গেল। দীর্ঘদিন ধরে এই পুজো স্বস্তিকার দপ্তরে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পুজোর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য কুমারী পুজো। প্রতিবছর নবমবর্ষীয়া বা তার থেকে কম বয়েসি কোনও সুলক্ষণা কন্যাকে মাতৃজ্ঞানে পুজো করা হয়। এবার স্বস্তিকার প্রাক্তন কর্মী জয়দীপ রায়ের ভাইঝি কুমারী হয়েছিলেন। সন্ধ্যে নামা মাত্র কলকাতা-সহ সমগ্র পশ্চিবঙ্গের নানা গুণীজন পুজোমণ্ডপে প্রতিমা দর্শন করতে আসেন। পত্রিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য সবাইকে স্বাগত জানান।

উবাচ

"যারা টুজি বা কয়লা গেট কেলেঙ্কারি করে অভ্যস্থ তারাই এখন জিএসটি নিয়ে বেশি চিৎকার করছে।"

জিএসটি নিয়ে রাহুল গান্ধীর তোপ দাগা প্রসঙ্গে

অরুণ জেটলি
অর্থমন্ত্রী

"স্বার্থপর বন্ধুর থেকে খোলামনের বিরোধী বেশি ভালো।"

শিবসেনার সাম্প্রতিক বিজেপি বিরোধিতা প্রসঙ্গে

দেবেন্দ্র ফড়নবীশ
মহারাষ্ট্রের
মুখ্যমন্ত্রী

"মধ্যপ্রদেশের উন্নয়নের হার গত আট বছরে দুই অঙ্কে রয়েছে। যা অন্য অনেক রাজ্যেই নেই।"

মধ্যপ্রদেশের উন্নয়ন নিয়ে বিরোধীদের কটাক্ষ প্রসঙ্গে

শিবরাজ সিংহ চৌহান
মধ্যপ্রদেশের
মুখ্যমন্ত্রী

"মুকুল রায় দল ছাড়ায় তৃণমূল কংগ্রেস ভয় পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে মুকুল রায় গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।"

মুকুল রায়ের পদত্যাগ প্রসঙ্গে

অরুণ সিংহ
বিজেপির কেন্দ্রীয়
সাধারণ সম্পাদক

"রাজ্য সরকারের চক্রান্তে অমিতাভ মালিক মারা গেছেন। আমি অমিতাভ মালিক-সহ পাহাড়ের আন্দোলনে যে ১২ জন মোর্চাকর্মী মারা গেছেন তাদের মৃত্যুর জন্য সিবিআই তদন্ত দাবি করি।"

অমিতাভ মালিকের মৃত্যু প্রসঙ্গে

বিমল গুরুং
মোর্চা সুপ্রিমো

দার্জিলিং-এর সাম্প্রতিক অশান্তি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

কমল মুখোপাধ্যায়

দার্জিলিং একটা বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সব থেকে কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্য বলে ঘোষণা করা হতো যে পাহাড় হাসছে, জঙ্গলমহল হাসছে। কিন্তু গত তিন চার মাস ধরে কী এমন ঘটনা ঘটল যে যার জন্য পাহাড় অশান্ত হয়ে গেল। বিমল গুরুংকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে সরকার দমন করতে বাধ্য হলো।

পাহাড় অর্থাৎ দার্জিলিং-এর গোর্খা, লেপচা, ভুটিয়া তাদের শারীরিক গঠন চালচলন সমতলের থেকে কিছুটা আলাদা অনস্বীকার্য। আশির দশকে সুভাষ ঘিসিং-এর বিধ্বংসী আন্দোলনের পর দার্জিলিং শান্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সুভাষ ঘিসিং-এর ঔদ্ধত্য, দুর্নীতি, একনায়কত্বর ফলে আবার অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল। গুরুং ও মমতার মধ্যে মা-বেটার সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। আবার মা বেটার মধ্যে অহি নকুল সম্পর্ক হয়ে গেল কেন?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে মমতার আগ্রাসী মনোভাব। তিনি যেমন পশ্চিমবঙ্গে সমতলে সকলকে কব্জার মধ্যে এনেছেন, যেন তিনিই একমেব অদ্বিতীয়ং, সেরকমটা পাহাড়েও করতে গিয়েছিলেন। তিনি গুরুংকে জিটিএ প্রধান করলেও তাকে স্বাধীনভাবে কোনো কাজ করতে দিতেন না। টাকাপয়সা দেওয়ার ব্যাপারে কার্পণ্য করতেন, যা সমতলে তিনি করে চলেছেন। কিন্তু গোর্খারা একটু একরোখা প্রকৃতির। তারা এটা মানবে কেন? তাছাড়া তাদের স্বাধীন গোর্খারাজ্যের স্বপ্ন তো ছিলই। তারপর তিনি গোর্খাদের ঐক্য ভাঙতে সচেষ্ট হলেন। তিনি লেপচা, ভুটিয়া আরও অন্যান্য জাতিগত সংগঠন করে দার্জিলিং-এ ভেদাভেদ করতে শুরু করলেন। সেজন্য গোর্খাদের মধ্যে একটা রোষ ধূমায়ত অবস্থায় বদ্ধ জায়গায় ছিল। তারা একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। তারপর তিনি যখন বাংলা ভাষা আবশ্যিক করে তৃতীয় ভাষা হিসাবে পড়ার কথা ঘোষণা করলেন তখন 'আই ডোন্ট নো' গল্পের মতো পাহাড়বাসী খেপে গেল তাদের বাংলাভাষী করার চেষ্টা হচ্ছে বলে। সেই সঙ্গে তিনি জিটিএ-র টাকা পয়সার হিসেব চেয়ে বসলেন। তৃণমূল

সরকারের কোন বিভাগের টাকা সঠিক ভাবে খরচ হয়। সঠিক ভাবে অডিট করা হয় কী? সুতরাং জিটিএ-তেও হয়তো সে ব্যাপারে কিছু অনিয়ম হয়েছে। তার হিসেব চাওয়ায় আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়ার শামিল হলো। সুতরাং পাহাড়বাসী খেপে গেল। তাদের গোর্খাল্যান্ড তো হলোই না উল্টে তাদের স্বাধীনতায়, সার্বভৌমত্বে, সেন্টিমেন্টে আঘাত লাগল। আর যাই হোক, বিমল গুরুং এবং তার দল তো ভোটে জয়ী, জনসমর্থন বেশির ভাগ তাদের দিকে। মমতা ব্যানার্জী সেখানে সেই সংগঠন ভেঙে নিজের দলের প্রভাব বাড়াতে সচেষ্ট হলেন। ফলস্বরূপ আগুন জ্বলে উঠল। বিস্ফোরণ ঘটলে তখন ভালমন্দের হুঁস থাকে না। ধ্বংসাত্মক কার্যে জনগণ প্ররোচিত হলো। ১০৪ দিন বন্ধ হলো। কেন্দ্রীয় সরকারে নির্দেশে বন্ধ প্রত্যাহার করা হলেও মমতা আবার Divde and rule চালু করার চেষ্টা করলেন। বিনয় তামাং ও অপর তিনজন বিধায়ককে প্ররোচিত করে গুরুংকে একঘরে করার চেষ্টা করা হলো। গুরুং তো রাজনীতি করে, তার পায়ের তলায় মাটি আলগা হয়ে যাচ্ছে। সেকি চুপচাপ বসে থাকবে। সেকি গান্ধীর অহিংসনীতি গ্রহণ করবে। ফলে মরিয়া হয়ে তার আধিপত্য কব্জা করা চেষ্টা করবে। এতে কোনো যুব অফিসার মারা গেলে সেকি চুপ করে বসে থাকবে। এখন তাকে ইউপিএ-তে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। এতে আগুন বাড়বে বই কমবে না। উচিত হচ্ছে গুরুং বা মোর্চা, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে নিয়ে শান্তিপূর্ণ ভাবে আলোচনা শুরু করা। কোনো পক্ষকেই হঠকারী হওয়া চলবে না। গায়ের জোরে সাময়িক শান্তি এলেও পরে আণবিক বিস্ফোরণের ন্যায় ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তার জন্য দায়ী থাকবেন মমতা ব্যানার্জী। যেমন সিঙ্গুরে কারখানা না হওয়ার পিছনে বুদ্ধদেববাবুর ও মমতার একগুঁয়েমীই দায়ী।

সংবিধান প্রদত্ত মত প্রকাশের অধিকার পশ্চিমবঙ্গে নেই

গূঢ় পুরুষের কলম

এ এক অদ্ভুত আঁধার নেমেছে আমাদের রাজ্য জুড়ে। লেখক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী সাধারণ মানুষ কারুর মত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন, পুলিশ তৃণমূলী রাজনীতির সামান্যতম সমালোচনা সোশ্যাল মিডিয়া বা পত্রপত্রিকায় করলে গ্রেপ্তার করছে। পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মানুষকে দু'হাত তুলে দিদির জয়ধ্বনি দিতে হবে। না দিলে যে কী হয় তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন বালুরঘাটের ব্যবসায়ী দেবজিৎ রায় ও অনুপম তরফদার। দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ শহরে যানবাহন নিয়ন্ত্রণের নামে টেটো, অটো, মোটর সাইকেল চলাচল পুজোর সময় বন্ধ করে দেয়। তার প্রতিবাদে তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ জানান। জেলার পুলিশ সুপার সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, পুলিশের ফতোয়ার বিরোধিতা করে তাঁরা মানুষের মনে পুলিশ সম্পর্কে বিরূপ ধারণা গড়ে তুলতে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। চমৎকার যুক্তি। পুজোর সময় যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করার কাজটা কীভাবে করতে হয় সেই ট্রেনিং না থাকায় শহরের যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ করাটা অনেক সহজ। এর বিরুদ্ধে কিছু বললে পুলিশ ধর্ষণের মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করে লকআপে বন্ধ করবে। দেবজিৎবাবু, অনুপম তরফদার এই প্রতিবেদন লেখার সময় পুলিশ হাজতে বন্দি আছেন।

গ্রেপ্তার না হলেও পুলিশের হাতে নিত্য হেনস্থার মুখে পড়ে নাজেহাল হচ্ছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কণক সরকার। কারণ, কণকবাবু তাঁর ফেসবুকে মন্তব্য করেছিলেন, 'দার্জিলিং-এ পুলিশ কর্মীর মৃত্যু দেখেও আমি দুঃখ প্রকাশ করতে পারছি না। কারণ, আমি পুলিশকে নিজের চোখে এত খারাপ কাজ করতে দেখেছি যে ঘৃণা লাগে।' এরপরেই কণকবাবুর কাছে পুলিশের তরফ থেকে প্রাণনাশের হুমকি আসা শুরু হয়েছে। কণকবাবু নতি স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন, 'আমি দশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কার্যকলাপ নিয়ে গবেষণা করছি। পুলিশের অনেক দুর্নীতি কাছ থেকে দেখেছি।' তাঁর অভিমত, মত প্রকাশের অধিকার সংবিধান-স্বীকৃত মৌলিক অধিকার। সেই অধিকার পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ রাজ্যের মানুষের কাছ থেকে আজ কেড়ে নিচ্ছে।

তাই বলছি, রাজ্যে এখন এক অদ্ভুত আঁধার নেমেছে। 'ডার্কনেস অ্যাট নুন।' ভরদুপুরে অমাবস্যার অন্ধকার। সবাই চুপ। এখন দিদির রাজত্ব চলছে। দার্জিলিং শহরের এস আই অমিতাভ মালিককে গুরুংপন্থীরা গুলি করে হত্যা করেছে। সত্যি? তাই যদি হয় তবে ময়না তদন্তের রিপোর্ট রাজ্য সরকার গোপন রেখেছে কেন? রিপোর্ট প্রকাশিত হলে জানা যাবে কত দূর থেকে কী ধরনের বুলেট অমিতাভর শরীরে বিঁধেছিল। এমন নয়তো যে বিমল গুরুংকে এনকাউন্টার করে মারার যুক্তি সাজাতে অমিতাভ মালিককে বলি দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটা এই প্রতিবেদকের নয়। সন্দেহ প্রকাশ করেছে সংবাদমাধ্যম। অমিতাভ মালিকের মৃত্যুর পরে দার্জিলিং পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয় যে পুলিশের জিপে চড়ে গুরুংকে গ্রেপ্তার করতে সিংলার জঙ্গলে যাওয়ার পথে গুলিবিদ্ধ হন অমিতাভ। গুরুতর আহত হন জিপের চালক কুমার তামাং। অথচ কুমার বলেছেন সেদিন তিনি (১৩ অক্টোবর) এস আই অমিতাভ মালিকের জিপ চালাননি। তাঁকে পাঠানো হয় একটি বিকল পুলিশের গাড়ি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসতে। পথে একদল যুবক তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। —'আমি একা ছিলাম। আমার সঙ্গে কেউ ছিল না।' সিংলার জঙ্গলে গুলির লড়াই তাঁর জানা ছিল না। তবে সেদিন কার গাড়িতে চড়ে অভিযানে গিয়েছিলেন অমিতাভবাবু? তিনি কি রক্ষী ছাড়াই একা জিপ চালাচ্ছিলেন? এমন গল্প বিশ্বাস করা যায় না। বলিউডের 'সিংহম' ছবিতে পুলিশের এস আই অজয় দেবগণ একাই দুর্বৃত্ত দমনে জিপ চালিয়ে ঘটনাস্থলে চলে যেতে পারেন। সিনেমার নায়কের কোনও সুরক্ষা কবচ লাগে না। কিন্তু সিনেমা আর বাস্তব জীবন যে এক নয় তা প্রয়াত অমিতাভবাবু অবশ্যই জানতেন। তাই বলছি, একমাত্র উচ্চ পর্যায়ের নিরপেক্ষ কেন্দ্রীয় তদন্ত হলেই রহস্যভেদ সম্ভব হবে।

এদিকে গুলির লড়াই চলার সময় গুরুংপন্থীদের গুলিতে এস আই অমিতাভ মালিকের মৃত্যুর গল্পটাই বিমল গুরুং ঘেঁটে দিয়েছেন। এক অডিও বার্তায় তিনি বলেছেন, ১৩ অক্টোবরের ভোরে লেপচা বস্তির কাছে সিংলার জঙ্গলে গুলির লড়াই আদৌ হয়নি। পুলিশ যেসব অস্ত্র সেদিন উদ্ধার করেছে বলে দাবি করেছে সেগুলি অনেককাল আগে কে এল ও জঙ্গিদের কাছ থেকে পাওয়া। বাজেয়াপ্ত করা সেইসব অস্ত্র সংঘর্ষের পর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে, এই দাবি মিথ্যা এবং বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচার করেছে পুলিশ কর্তারা। সমস্যাটা এখানেই। মোর্চার সঙ্গে গুলির লড়াইয়ের গ্রহণযোগ্য এভিডেন্স এখনও পর্যন্ত দার্জিলিং পুলিশ প্রশাসন দিতে পারেনি। ফলে সন্দেহ বাড়ছে। তবে তৃণমূলের রাজত্বে প্রকাশ্যে সন্দেহ প্রকাশ করা যাবে না। কারণ, আবার বলছি সংবিধান প্রদত্ত মত প্রকাশের স্বাধীনতা পশ্চিমবঙ্গে নেই।

বিজেপি যেন বাঘ মামা

মাননীয় পার্থ চট্টোপাধ্যায়
মহাসচিব, তৃণমূল কংগ্রেস,

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মুকুল রায় আপনার বড় দাদার মতো। কিন্তু এটা তিনি কী করলেন বলুন তো! রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে বারবার বাচ্চা ছেলে বলা কি ঠিক কাজ! আপনি দায়িত্বের ওজনে রীতিমতো হেভিওয়েট। মন্ত্রিসভাতেও আপনি হেভিওয়েট। কিন্তু আপনাকে এই ভাবে বাচ্চা ছেলে বলে এলেবেলে বানিয়ে দেওয়াটা মেনে নেওয়া যায় না।

আপনিও দেখছি বাচ্চা ছেলের মতো ভুল কাজ করছেন। সবাইকে মুকুল সম্পর্কে বলছেন, ব্যক্তির থেকে দল বড়। মুকুল রায়ের বিচ্ছেদপর্বে দলের নীচের তলায় এই নীতি-বার্তা পৌঁছে দিতে এমন নির্দেশ কি তৃণমূলনেত্রী দিয়েছেন?

নদিয়ায় জেলা নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে আপনি তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, দলের প্রতি আনুগত্য না থাকলে জায়গা নেই তৃণমূলে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে দলের চ্যালেঞ্জ হিসেবে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ করে নেতাদের সতর্ক করে দিয়েছেন আপনি। যা শুনছি দলের জরুরি সভায় এ ব্যাপারে দলের অবস্থান নির্দিষ্ট করে দেবেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই। তার আগে আপনার এই মন্তব্য থেকে নেত্রীর মনই বুঝতে চাইছেন দলের নীচের তলার নেতারা। মুকুলের মতো গুরুত্বপূর্ণ নেতা দল ছাড়ার পর প্রায় ১৫ দিন কেটে গেলেও এ নিয়ে এখনও প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্যই করেননি দিদি মমতা। আর ভাই বলছেন ব্যক্তি নয়, দল বড়। আর সেটা আবার মুকুল রায়ের মুঠোয় থাকা জেলায় গিয়ে।

মুকুলের নাম না করেও সংগঠন ধরে রাখতে আপনি যা বলেছেন তাতে স্পষ্ট, প্রাক্তন ওই সাংসদের দলত্যাগের প্রভাব পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। বৈঠকে জেলা নেতাদের দলের পুরনো নেতা, কর্মীদের প্রাপ্য গুরুত্ব দিতে বলেছেন। জানিয়েছেন, দলে এমন অনেকেই এসেছেন, যাঁরা ভালো লোক নন। দলীয় পতাকা নিয়ে 'ব্যবসা' করার মানসিকতা রয়েছে তাঁদের। নদিয়ায় মুকুলের ব্যক্তিগত প্রভাব বরাবরই রয়েছে। সেই সূত্রেই সেখানে সাংগঠনিক শৃঙ্খলার উপরে জোর দেওয়ার পাশাপাশি দলে অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ শুরু হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন আপনি।

কিন্তু পার্থবাবু, আপনার কোনও ব্যক্তিগত ক্যারিশমা নেই তা সবাই জানে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসে ব্যক্তি কিছু নয় এটা কী করে বলছেন! আপনিই তো কদিন আগে বললেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি সরিয়ে নিলে দলে কেউ কিছু নয়। এই দলে সবটাই মমতা। একদম খাঁটি কথা বলেছেন। রাজ্যের ৪২টি লোকসভা কেন্দ্রে কিংবা ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে সর্বত্রই প্রার্থী হন মমতা। তাঁকে দেখেই জনতা ভোট দেয়। হারটাও তাঁর। জয়টাও তাঁর। আপনার দলের সংস্কৃতি হচ্ছে— জিতলে জয়ীকে বলতে হয় দিদির মা-মাটি-মানুষের আশীর্বাদে এই জয় দিদির জয়। তাহলে!

বিজেপি ক্রমশ বাঘ হয়ে উঠছে। বাঘ মামা গিলতে আসছে। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলে তো আরও বিপদ। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন।

— **সুন্দর মৌলিক**

জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে মিত্রদেশের সন্ধান ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ— দুটোই করে চলেছে মোদী সরকার

ড: নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত

ভারত সম্প্রতি কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য দেখিয়েছে। অবশ্য বর্তমানে বিশ্ব-পরিস্থিতি অনেকটাই অনুকূল। কিন্তু তাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রভূত বাস্তববোধের পরিচয় দিয়েছেন। এতকালের আবেগধর্মী ও একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়ে বিদেশনীতিতে এনে দিয়েছে গতিশীলতা, বিচক্ষণতা ও শক্তিতত্ত্ব। এর ফলে আমরা আগের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপত্তার সন্ধান দেখতে পাচ্ছি। আসলে আমাদের পাশেই রয়েছে দুই শত্রু রাষ্ট্র—পাকিস্তান ও চীন। পাকিস্তান আমাদের ওপর তিনবার যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, আর চীন ১৯৬২ সালে ভারত আক্রমণ করে কয়েক বর্গমাইল জমি দখল করে নিয়েছে।

এই অবস্থায় দুটো জিনিসের দরকার ছিল—মিত্ররাষ্ট্রের সন্ধান ও প্রতিরক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা। বলাবাহুল্য মোদী সরকার দুটো বিষয়েই বেশ তৎপরতা দেখিয়েছে। মনে রাখতে হবে, পাকিস্তান তার জন্মলগ্ন (১৬ আগস্ট, ১৯৪৭) থেকে ভারতের বিরুদ্ধে বৈরিতা শুরু করেছে। অসিত কুমার সেন মন্তব্য করেছেন, The fact of partition of sub-continent in 1947 generated bad blood between India and Pakistan (ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন, পৃঃ ৫১৭)। তাঁর মতে উদ্বাস্তু সমস্যা, সিন্ধুনদের জল বণ্টন, কাশ্মীর সমস্যা ইত্যাদি বিষয় দুই দেশের মধ্যে ক্রমে তিক্ততা বৃদ্ধি করেছে। বিশেষ করে কাশ্মীর হয়ে উঠেছে এক ঝটিকা-কেন্দ্র।

ব্রিটিশ সরকারের ভারত ত্যাগের আগে এই দেশে ৫৬২টা দেশীয় রাজ্য ছিল। ভারত বিভাজনের ফলে সরকারের জানা ছিল যে এই রাজ্যগুলোর রাজা বা নবাব ইচ্ছে করলে স্বাধীন থাকতে পারবেন অথবা 'ইনস্ট্রুমেন্ট্ অব অ্যাকসেসন'-এ স্বাক্ষর করে ভারত বা পাকিস্তানে যোগও দিতে পারবেন। সেই ঘোষণা অনুসারে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্য ভারত এবং কিছু রাজ্য পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিল।

কাশ্মীর মুসলমান অধ্যুষিত হলেও রাজা হরি সিংহ ছিলেন হিন্দু। তিনি প্রথম দিকে স্বাধীনভাবেই থাকতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ২২ অক্টোবর পাক বাহিনী কাশ্মীরে ঢুকে অনেকটা দখল করে নেয়। বিপদ বুঝে রাজা ভারতের সাহায্য চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পূর্বোক্ত দলিলে স্বাক্ষর না করলে নেহরু সরকারের কিছু করার ছিল না। সেইজন্য হরি সিংহ তড়িঘড়ি ইনস্ট্রুমেন্টে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং একটা চিঠিতেও ভারত-ভুক্তির ইচ্ছে জানিয়েছেন। তাই সংবিধান বিশেষজ্ঞ দুর্গাদাস বসু জানিয়েছেন যে, কাশ্মীরের ভারত-ভুক্তি সম্পূর্ণ বৈধ, ন্যায়সঙ্গত ও ঐতিহাসিক ব্যাপার (ইন্ট্রোডাকশান টু দ্য কন্‌স্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ২২৯)। এরপর ভারতীয় বাহিনী দখলীকৃত কাশ্মীরের অনেকটা অংশ উদ্ধার করে কিন্তু নেহরুর মারাত্মক ভুলে কিছুটা অংশ রয়ে গেছে পাকিস্তানের দখলে। তারপর পাকিস্তান ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালে দুবার যুদ্ধ করেছে। তবে দু'বারই তাদের হার হয়েছে (ড. বিদ্যাধর মহাজন, দ্য কন্‌স্টিটিউশান অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৩৪৪)।

অতঃপর পাকিস্তান সম্মুখ সমরের নীতি বদল করে নিয়েছে সন্ত্রাসবাদের ঘৃণ্য পথ। অজস্র পাক-আতঙ্কবাদী নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে চার দশক ধরে। কিন্তু চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কটা তিক্ত হওয়ার কথা ছিল না। প্রাচীনকাল থেকেই এই দুই দেশের মধ্যে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল নিবিড়। দুটো দেশ একইভাবে পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদের শিকার হওয়ায় তাদের যৌথ সমস্যা তাদের আরও কাছে টেনেছে।

১৯৪৯ সালে কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্বে চীন পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে ভারত তাকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশেষ করে ১৯৫৪ সালে চীনা প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন্-লাই ভারতে এলে বিপুল সংবর্ধনার মধ্যে 'হিন্দি-চীনা ভাই-ভাই" ধ্বনি নিবিড় বন্ধুত্বের আভাস দিয়েছিল। অথচ এর পরেই চীন ভারতের ২৫,০০০ বর্গমাইল এলাকা দাবি করেছে (ভি. এন. খান্না—ফরেন পলিসি অব ইন্ডিয়া, পৃ. ১১৯)। এমনকী, ১৯৬২ শীতে চীন হঠাৎ করে আক্রমণ করে অসমের দিকে চলে এসেছিল। কে. বি. কেশওয়ানি মন্তব্য করেছেন, ''On October, 1962, China launched a militery offensive in Ladakh and seized more area than they had previously demanded'—(ইন্টারন্যাশনাল রিলেশান, পৃ. ৫৮০)। কলম্বোতে কয়েকটি জোট-নিরপেক্ষ দেশ মীমাংসার চেষ্টা করলেও চীন তাতে সাড়া দেয়নি। সেবার আমেরিকা, ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ অবশ্য ভারতকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল, কারণ ওই দিক থেকে দেশ নিরাপদ ভেবে মস্তিষ্কহীন নেহরু প্রতিরক্ষার সুব্যবস্থাই রাখেননি। বি. এম. কল্—দ্য আনটোল্ড স্টোরি, পৃ.

৩৩১। অন্যতম সেনাপতি দলবীরও জানিয়েছেন, সেটা নিছক 'unfought war'।

এরপর চীন বিদ্রোহী শত্রুদের অস্ত্র দিয়েছে, অরুণাচল দাবি করেছে, সিকিমের ভারত-ভুক্তির প্রতিবাদ করেছে। ভারতের পারমাণবিক গবেষণার নিন্দা করেছে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। একটা কমিউনিস্ট দেশ, অন্যটা মার্কিন দোসর কিন্তু ভারত বৈরিতায় তারা মিত্র। ১৯৬৫ ও ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে চীন তাই পাকিস্তানকেই সমর্থন করেছে। এমনকী ভারতকে হুঁশিয়ারিও দিয়েছে।

এই কারণে এস. ক্লিমেন্ট মনে করেন, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও অনেক মজবুত করতে হবে, হতে হবে পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র—''We have no other alternative (ইন্টারন্যাশনাল রিলেশান, পৃ. ২১৩)। অবশ্যই আমরা শান্তির সন্ধানী কিন্তু শান্তি শক্তিরই সংহত রূপ। সেই সঙ্গে দরকার মিত্র সন্ধান ও বিশ্ব রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার।

মোদী সরকার সেই কাজটাই করেছেন। প্রথমত জাপানের সঙ্গে অনেকগুলো চুক্তি হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে পরিকাঠামো উন্নয়ন, বুলেট ট্রেন প্রকল্প, যৌথ নৌ ও বিমান মহড়ার ব্যবস্থা, তৈল উত্তোলন প্রযুক্তি ইত্যাদি। এর আগে জাপানের শর্ত ছিল পরমাণু গবেষণায় সাহায্য করা যাবে শুধু শান্তির স্বার্থেই। এবার কিন্তু সেই শর্ত উঠে গিয়েছে—দেখা দিয়েছে নতুন সম্ভবনা। শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা ভারতের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে। সেই সঙ্গে পরমাণু গবেষণার চুক্তি আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেও উন্নত করবে।

দ্বিতীয়ত, শ্রীমোদী ইজরায়েলের সঙ্গেও মিত্রতাকে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ শাসকের ভ্রান্তি, হঠকারিতা ও একপেশে বিদেশনীতির ফলে আমরা ইজরায়েলকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত অচ্ছুত করে রেখেছিলাম অথচ তার জন্ম ১৯৪৮ সালে। ১৯৪৮, ১৯৫৬, ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালে মিশর-ইরাক প্রভৃতি আরব রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে ইজরায়েলকে ধ্বংস করতে চেয়েছে চতুর্মুখী আক্রমণের মাধ্যমে। অথচ অভিমন্যুর মতো লড়াই করে সেই দেশ তার অবিশ্বাস্য রণনিপুণতার পরিচয় দিয়েছে। এইচ. জি. ওয়েলস্ মন্তব্য করেছেন সম্মিলিত বাহিনী 'was drastically defeated''—(এ শর্ট্ হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ড, পৃ. ৩৫৩)। এই শক্তিধর রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতা ও চুক্তি আমাদের শক্তি বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রসঙ্ঘ (United Nations) ও অন্যান্য বহুজাতিক মঞ্চে বারবার সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করা হয়েছে এবং ভারতের ভূমিকা প্রশংসিত হয়েছে। এটাও ভারতের কূটনৈতিক জয়।

চতুর্থত, সম্প্রতি প্রধানত চীনকে রোখার জন্য আমেরিকা ২২টা গার্ডিয়ান ড্রোন্ ভারতকে বিক্রি করতে রাজি হয়েছে। এতকাল আমেরিকা পাকিস্তানকেই সাহায্য করত। এবার এই চুক্তি আমাদের নৌ-বাহিনীকে সমৃদ্ধ করবে।

পঞ্চমত, ডোক্‌লাম নিয়ে চীন কিছুদিন আগে আমাদের হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু আমাদের সেনাধ্যক্ষ বিপিন রাওয়াত কড়া ভাষায় জবাব দেওয়ায় চীন তার সুর নরম করেছে। রাশিয়া, আমেরিকা ইত্যাদি দেশও এই ব্যাপারে ভারতের প্রশংসা করেছে তার সততা সংযমের কারণে। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রেও আমাদের কূটনৈতিক সাফল্য ঘটেছে।

আরও বড় কথা হলো এবার ব্রিক্ সম্মেলনেও ভারতের জয় হয়েছে। রাশিয়া, চীন, ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিয়ে গঠিত এই সম্মেলন গত বছর বসেছিল ভারতের গোয়াতে। পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী দেশ বলে চিহ্নিত করার ভারতীয় প্রয়াসে চীন তখন বাধা দিয়েছিল। কিন্তু এবার চীনের জিন্‌পিংয়ের সামনেই ৩০ পৃষ্ঠার যৌথ বিবৃতিতে ১৭ বার সন্ত্রাসবাদের নিন্দা এবং জইশি-ই-মহম্মদ, লস্কর-ই-তৈবা, আল্-কায়দা, ইত্যাদি জঙ্গি সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। বলা হয়েছে সন্ত্রাসবাদকে যারা মদত দেয় বা সমর্থন করে, তারা বিশ্ব-মানবতার চিরশত্রু।

বলা বাহুল্য, পাকিস্তানই হলো সন্ত্রাসবাদের সূতিকাগৃহ। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রকারান্তরে তাকেই নিন্দা করা হয়েছে। চীন কিন্তু এক্ষেত্রে যৌথ ইস্তাহারে স্বাক্ষর দিয়েছে। শুধু তাই নয়; 'নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ার্স গ্রুপ' বা এন. এস. জি.-তে ভারতকে নেওয়ার ব্যাপারে চীনের আপত্তিও ধোপে টেকেনি। বলা হয়েছে এশিয়ার শান্তির স্বার্থে ভারতকেও এই সংস্থায় রাখা দরকার। বলা দরকার এটিতে ভারতের মস্ত বড় সাফল্য।

এটা বাস্তব সত্য যে, বিপরীতধর্মী দুটো দেশ ভারত বৈরিতার কারণে হাত মিলিয়েছে—তারা 'Strange badfellows'। মতাদর্শকে শিকেয় তুলে দিয়ে তারা নিয়েছে অভিন্ন বিদেশনীতি। কে. জে. হল্‌স্টি মনে করেন জাতীয় স্বার্থকে রক্ষা করাই বিদেশনীতির লক্ষ্য (ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স, পৃ. ১২৪)। সুতরাং নেহরু-ইন্দিরার একঘেয়ে নীতি বদল করে ভারতকেও বাস্তবের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। কমিউনিস্ট রাশিয়া দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তত্ত্বাদর্শকে মুল্‌তুবি রেখে ধনতান্ত্রিক মিত্রশক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল জার্মানিকে রুখে দেওয়ার জন্য। আমাদেরও তেমনি একদিকে মিত্রের সন্ধান করে কূটনৈতিক দিক থেকে এগোতে হবে, অন্যদিকে বিভিন্ন দেশের সাহায্য নিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে। জাতীয় নিরাপত্তার জন্য দরকার এই দ্বি-মুখী ব্যবস্থা।

সংবিধানের ৩৭০ ধারার সঙ্গে ৩৫-এ ধারাকেও বিদায় জানানো উচিত

ধর্মানন্দ দেব

ভারতের সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারা নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। কিন্তু তার মধ্যে সম্প্রতি কাশ্মীরকে বিশেষ অধিকার দেওয়া সংবিধানের ৩৫-এ নম্বর ধারা নিয়ে চলছে সমগ্র দেশব্যাপী আলোচনা। মনে রাখা দরকার, কাশ্মীর ভারতের মুকুট। কাশ্মীর ছাড়া ভারতের কল্পনা অসম্পূর্ণ। এখন আমরা এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছি। তাই আমাদের নিজেদের দিকে ফিরে তাকানোর সময় এখন। ভারতের সংবিধানের প্রধান দুষ্টক্ষত ৩৭০ নম্বর ধারা নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। কিন্তু সম্প্রতি কাশ্মীরকে বিশেষ অধিকার দেওয়া সংবিধানের ৩৫-এ নম্বর ধারা নিয়ে চলছে সমগ্র দেশব্যাপী আলোচনা। উল্লেখ্য, জম্মু ও কাশ্মীর দুই উপত্যকার মধ্যে কাশ্মীর উপত্যকায় বেশিরভাগ মুসলমান সম্প্রদায়ের বসবাস। তোষামোদের জন্যই জওহরলাল নেহরু ছিলেন ৩৭০ নম্বর ধারার সমর্থক। অন্যদিকে, কেন্দ্রের বর্তমান ক্ষমতাসীন দল বিজেপি ৩৭০ নম্বর ধারা বাতিল করার পক্ষে। তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারেও এই কথা পাওয়া যায়। জানা যায় সংবিধান প্রণেতা ড. বি. আর আম্বেদকর সংবিধানে ৩০৬(এ) (বর্তমানে ৩৭০) ধারার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাই তিনি উক্ত অনুচ্ছেদের খসড়া পর্যন্ত তৈরি করতে অস্বীকার করেন। তখনকার প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু উক্ত অনুচ্ছেদের খসড়া তৈরি করার জন্য শেখ আব্দুল্লাকে আম্বেদকরের কাছে পাঠালে আম্বেদকর বলেন—''Mr. Abdullah, you want that India should defend Kashmir, India should develop Kashmir and Kashmiris should have equal rights as the citizens of India, but you don't want India and any citizen of India to have any rights in Kashmir. I am the Law minister of India. I cannot betray the interest of my country''. পরে এই অনুচ্ছেদটির খসড়া তৈরি করেন হরি সিংহ মন্ত্রীসভার মন্ত্রী গোপালস্বামী আয়েঙ্গার। সংবিধানে কেন ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ যুক্ত হয়েছিলো সে বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলে নেওয়া দরকার। জম্মু-কাশ্মীরের রাজা ছিলেন ডোগরা বংশীয় হরি সিংহ। জম্মু-কাশ্মীরের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লা ছিলেন কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। ২৬ অক্টোবর ১৯৪৭ সালে রাজা হরি সিংহ ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করেন। রাজা হরি সিংহ জওহরলাল নেহরুর চাপে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষে শেখ আব্দুল্লাকে বসান এবং সেনাবাহিনী শ্রীনগরে অবতরণ করে। পরে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে ১৯৪৯ সালের ২৯ জুলাই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়। আর এই চুক্তি অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ভারতের তৎকালীন আইনসভা (Constituent Assembly) ভারতীয় সংবিধানে ৩০৬(এ) ধারা যুক্ত করে জম্মু-কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ স্বায়ত্তশাসনের বিষয়টি মেনে নেয়। পরে ভারত-নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীর অঞ্চলে নির্বাচনের মাধ্যমে একটি আইনসভা গঠিত হয়। ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে সেই আইনসভা নির্বাচনে ন্যাশনাল কনফারেন্স সবকটি আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। ১৯৫২ সালের ২৪ জুলাই শেখ আব্দুল্লা ও জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে এক চুক্তি করে উপরের ৩০৬(এ) ধারা বদল করে ৩৭০ ধারার জন্ম দেওয়া হয়। এখনও লোকসভায় ৩৭০ নম্বর ধারা বাতিল করা নিয়ে সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত প্রাইভেট মেম্বার বিল—২০১১ পড়ে রয়েছে। ভারতের সুপ্রিমকোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চেও এনিয়ে মামলা চলছে।

ভারতীয় সংবিধানের ২১তম অধ্যায় অর্থাৎ 'অস্থায়ী, পরিবর্তনসূচক এবং বিশেষ চুক্তি' (Temporary, Transitional And Special Provisions) সংবলিত অধ্যায়ে মোট ২৩টি ধারা রয়েছে—২৬৯ ধারা হতে ৩৯২ ধারা পর্যন্ত। অধ্যায় শিরোনাম থেকে পরিষ্কার যে এগুলি অস্থায়ী। শুধু তা নয়, ৩৭০ নম্বর ধারাটিও অস্থায়ী হিসাবে ওই অধ্যায়ে যুক্ত করা হয়েছিল। শিরোনামটি ছিল এইরূপ—Temporary provision with respect to the State of Jammu & Kashmir। দীর্ঘ ৭০ বছর পেরিয়ে গেলেও এই অস্থায়ী ধারাটি বিলোপ করার সময় কি এখনো আসেনি? আর কতদিন অস্থায়ী হিসাবে থাকবে? একই দেশে কেন একটিমাত্র রাজ্যের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা? অন্য রাজ্যের সঙ্গে কি বৈমাতৃসুলভ আচরণ হচ্ছে না?

ভারতের সংবিধানের ৩৭০ এবং ৩৫-এ ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে—(১) কেন্দ্র ও রাজ্যের হাতে, ভারতের সমস্ত রাজ্যের ক্ষেত্রে প্রয়োগের

ক্ষেত্রে যে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে তার বাইরে যদি কোনো আইন প্রণয়ন করতে হয় তা করতে পারে একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার বা সংসদ। কিন্তু এই ৩৭০ ধারার উপধারাতে বলা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের আইনসভার হাতেই থাকবে। (২) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের অধিবাসীরা কী সুযোগ ও অধিকার পাবেন, কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ করা যাবে কী না তা ঠিক করবে রাজ্যের আইনসভা। (৩) দেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকার অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণ করতে হলে রাজ্য সরকার ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য, কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকার কতটুকু এবং কীভাবে প্রয়োগ হবে তা ঠিক করবে রাজ্য আইনসভা। (৪) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের জাতীয় পতাকা আলাদা। দেশের জাতীয় পতাকার সঙ্গে ওই পতাকাও উড়বে। (৫) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে ভারতীয় জাতীয় পতাকা বা অন্য রাষ্ট্রীয় প্রতীক অপমান করা অপরাধ নয়। (৬) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের কোনো মেয়ে ভারতের অন্য কোনো রাজ্যের ছেলেকে বিয়ে করলে মেয়েটি কাশ্মীরের নাগরিকত্ব হারাবে। কিন্তু পাকিস্তানের কোনো নাগরিক জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে বিয়ে করলে সে জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের নাগরিক হবে। (৭) জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের হিন্দু বা শিখদের চাকুরি বা প্রশাসনে কোনো সুযোগ নেই। (৮) জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিধানসভার কার্যকাল ৬ বছর আর ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বিধানসভার মেয়াদ ৫ বছর। (৯) Right To Education Act, Right To Information Act, CAG ইত্যাদি জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে প্রযোজ্য নয়।

জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের আইনসভা রাজ্যের সংবিধান সংশোধন করে প্রশাসনিক প্রধানের নামকরণ করে সদর-ই-রিয়াসত। রাজা হরি সিংহের পুত্র যুবরাজ করণ সিংহকে উক্ত পদে নিযুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৬৩ সালে সদর-ই-রিয়াসতের অফিস এবং কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীর পদ ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী পদে পরিবর্তন করা হয়। ১৯৮২ সালে শেখ আব্দুল্লার মৃত্যু হয় এবং তার পুত্র ফারুক আব্দুল্লা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন। ভারতের সংবিধানে মোট ৩৯৫টি ধারা রয়েছে, আর তার মধ্যে ১৩৫টি ধারা জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে প্রযোজ্য নয়। সাংবিধানিক অচলাবস্থা দেখা দিলেও জম্মু-কাশ্মীর এমন একটি রাজ্য যেখানে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হয় না এবং রাষ্ট্রপতিরও ক্ষমতা নেই রাজ্যের সংবিধান বাতিল করার। আবার রাজ্যপাল নিজ শাসন ৬ মাসের জন্য রাজ্য সংবিধানের ধারা ৯২ অনুসারে জারি করতে পারেন। তাদের আলাদা জনপ্রতিনিধিত্ব আইন রয়েছে, আলাদা সংবিধান রয়েছে ও তাদের দ্বৈত নাগরিকত্বও রয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্য সংবিধানে মোট ১৫৮টি ধারা, ১২টি খণ্ড ও ৭টি তপশিল রয়েছে। আর উক্ত সংবিধানের প্রস্তাবনাতেও উল্লেখ আছে যে জম্মু-কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

উল্লেখ্য, ভারতের সংবিধানের ৩৫-এ ধারা তুলে নেওয়ার জন্য ২০১৪ সালে We the Citizens নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সুপ্রিমকোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করে। যার নম্বর ৭২২/২০১৪। ২০১৫ সালে West Pakistan Refugees Action Committee Cell-1947 নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সুপ্রিমকোর্টে আরও একটি রিট পিটিশন দাখিল করে। যার নম্বর ৮৭১/২০১৫। অবশ্য পরে দু'টি রিট পিটিশনকে এক সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়। ১৭ জুলাই ২০১৭ সালের সুপ্রিমকোর্টের এক নির্দেশ থেকে জানা যায় ভারতের অ্যাডভোকেট জেনারেল কে বেণুগোপাল আদালতকে স্পষ্ট জানান ''That a conscious decision has been taken not to file any counter affidavit in this case, because the issues which are raised for adjudication, are pure questions of law.''

সুপ্রিমকোর্ট ওই নির্দেশেই বিষয়টির চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য তিন বিচারপতির এক ডিভিশন বেঞ্চে পাঠিয়ে দেয় সম্ভবত আগামী সেপ্টেম্বর মাসেই চূড়ান্ত শুনানি হবে। তারমধ্যে আবার গত ২৫ মে ২০১৭-তে জন্মসূত্রে এক কাশ্মীরি পণ্ডিত মহিলা ড. চারুওয়ালি খান এবং ড. সীমা রাজদন ভার্গব সংবিধানের ৩৫-এ নম্বর ধারায় বদল চেয়ে সুপ্রিমকোর্টে আরেকটি রিট পিটিশন দাখিল করেন। যার নম্বর ৩৯৬/২০১৭। পিটিশনে চারুওয়ালি খান অভিযোগ করে বলেন বিবাহসূত্রে তিনি এখন রাজ্যের বাহিরে থাকেন এবং তিনি নাকি তাঁর পারিবারিক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। তাই ওই ধারায় পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। অ্যাডভোকেট জেনারেল কে বেণুগোপাল সুপ্রিমকোর্টে বলেন, ৩৫-এ ধারার বিরুদ্ধে ওই মহিলার পিটিশনে রীতিমত সংবেদনশীল প্রশ্ন তুলেছেন, তাই এ ব্যাপারে বিতর্ক হোক। তাৎপর্যপূর্ণভাবে কেন্দ্র ওই মামলায় কোনো কাউন্টার এফিডেভিট ফাইল করেনি। কাশ্মীরি পণ্ডিত মহিলা তথা সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী ড. চারুওয়ালি খান স্পষ্ট জানান : ''Article 35A can be struck down on the sole ground that it was incorporated in the Indian Constitution through a Presidential Order on May 14, 1945, bypassing Parliament. She has challenged the notification dated April 20, 1927 issued by the Maharaja Bahadur of Kashmir. Look at the irony. I can work and buy property anywhere in India, in fact the world, except in Jammu and Kashmir to which me and my ancestors belonged to.'' আর বিজেপি এবং

জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে বিষয়টি নিয়ে চলছে তুমুল মতান্তর। বিজেপি বলছে সংবিধানের ৩৫-এ ধারা সাংবিধানিক ভুল, সংসদীয়ভাবে নয়; দেশের রাষ্ট্রপতির নির্দেশে তা বলবৎ হয়েছে। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি বলেন ৩৫-এ ধারা তুলে দিলে নাকি কাশ্মীরে তেরঙ্গা ধরার কেউ থাকবে না। হায়, কী অবাক কাণ্ড!

পরিশেষে বলব, সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারা দু'টি কাশ্মীরের মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্ম দিচ্ছে এবং ক্রমশ স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে রাজ্যের উন্নয়ন। কাশ্মীর ও অবশিষ্ট ভারতের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছে এবং তৈরি করছে ভিন্ন পরিচয়। কেননা সংবিধানের ৩৫-এ ধারা অনুসারে কাশ্মীরের রাজ্য সরকার ঠিক করবে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা কারা। অন্য রাজ্যের মানুষের কাশ্মীরে জমি কিনে বসবাসের অধিকার নেই। ভোটদান, রাজ্যের দেওয়া স্কলারশিপ, সরকারি চাকরির অধিকারও অন্যদের নেই, শুধু ওই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দাদের এই অধিকার রয়েছে। বিবাহসূত্রে কেউ যদি অন্য রাজ্যের বাসিন্দা হন, তাহলে তিনি কাশ্মীরে তাঁর প্রাপ্য সম্পত্তির অধিকার থেকেও বঞ্চিত হবেন। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি কীভাবে সংবিধানে থাকা সাম্যের অধিকার (সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারা) লঙ্ঘন হচ্ছে তুলে ধরছি। জম্মু-কাশ্মীরের ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুখ আব্দুল্লা এবং পুত্র ওমর আব্দুল্লা বিয়ে করেন অ-কাশ্মীরি মহিলাকে। এই ক্ষেত্রে কিন্তু ফারুক আব্দুল্লা বা ওমর আব্দুল্লার স্থায়ী বাসিন্দার অধিকার বা জমির অধিকার মোটেই নষ্ট হয়নি কিন্তু ওই ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুক আব্দুল্লার মেয়ে সারা আব্দুল্লা বিয়ে করেন কংগ্রেস নেতা শচিন পাইলটকে এবং 'সারা আব্দুল্লা' কাশ্মীরে স্থায়ী বাসিন্দা এবং সম্পত্তির অধিকার হারিয়ে ফেলেন শুধু মাত্র সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারার উপর নির্ভর করে ৩৫-এ ধারা তৈরি হওয়ায়। এটাতো নারী সমাজের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ। তাই এটা মোটেই সংবিধান স্বীকৃত হতে পারে না। ফলস্বরূপ কাশ্মীরের সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের মানুষের ক্রমশ মানসিক দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। দেশের স্বার্থে ওই দু'টি ধারাকে এখনই বিদায় জানানো প্রয়োজন। অবশ্য সবকিছু নির্ভর করবে সুপ্রিমকোর্টের চূড়ান্ত নির্দেশের উপর।

আশা রইল সুপ্রিমকোর্টের চূড়ান্ত নির্দেশে দূর হবে সামাজিক বৈষম্য। জম্মু-কাশ্মীর-সহ সমগ্র দেশ পরিচালিত হবে এক ভারতীয় সংবিধান কর্তৃক। অন্যান্য রাজ্যের পাশাপাশি তখন জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যেরও সমান উন্নয়ন হবে। গড়ে উঠবে এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত।

(লেখক আইনজীবী)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

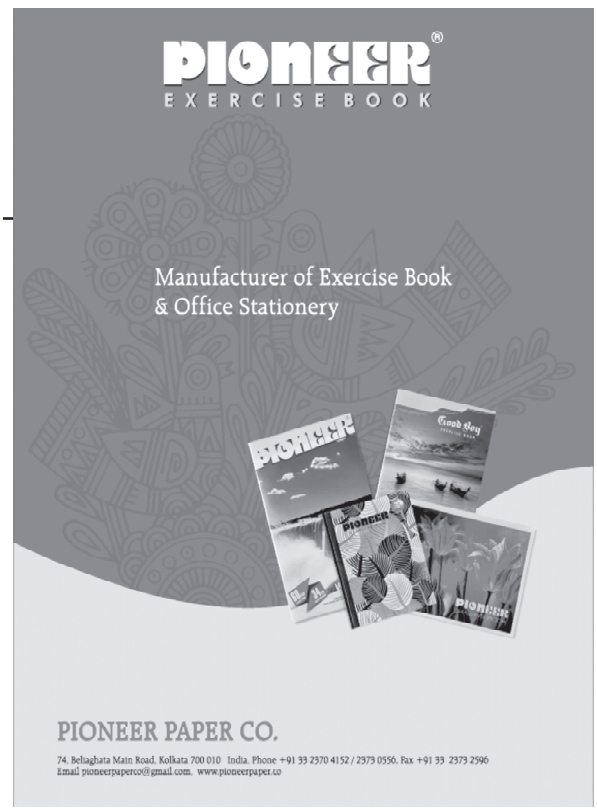

ভারতীয় রেল নিয়ে বিভ্রান্তিকর নেগেটিভ প্রচার ও তার ভবিষ্যৎ

সঞ্জয় কুমার দাস

সাম্প্রতিক অতীতে কয়েকটি ট্রেন দুর্ঘটনার কথা অনেকেই জানেন। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এর ফলে কিছু মানুষ নিহত ও আহত হন। এই ঘটনায় সারাদেশ জুড়ে তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। কিছু বুদ্ধিজীবী, স্বার্থান্বেষী মিডিয়া এমন আচরণ করল যেন এধরনের ঘটনা ভারতে প্রথম ঘটল। দাঁত নখ বের করে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল। সকলের মধ্যে সত্য গোপনের একটা আপ্রাণ প্রচেষ্টা দেখা গেল। বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর নাকি এই দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে। ট্রেনের ভাড়া বাড়ানো সত্ত্বেও রেলের সঠিকভাবে পরিচর্যা হচ্ছে না। ফলে যাত্রী সুরক্ষা আজ প্রশ্নের সম্মুখীন। এভাবেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এরা সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা গেল গেল রব তুলে দিল। মনে হলো স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে আজ পর্যন্ত এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি। তৎকালীন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু এই দুর্ঘটনার দায় নিজের কাঁধে নিয়ে পদত্যাগ করলেন। প্রশ্ন হলো, সত্যি কি পদত্যাগ করার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল? এর আগেও কত দুর্ঘটনা হয়েছে। কই তখন তো কোনো রেলমন্ত্রীকে এভাবে পদত্যাগ করতে হয়নি। কিন্তু কী এমন কারণ তৈরি হল যার জেরে সুরেশ প্রভুকে পদত্যাগ পর্যন্ত করতে হলো। নাকি আগের অধিকাংশ রেলমন্ত্রীদের মতো ওর গন্ডারের চামড়া নেই। সারণিতে ২০১৭ সালে ঘটা কয়েকটি ট্রেন দুর্ঘটনার বিবরণ দেওয়া হলো।

এইসব দুর্ঘটনার কারণগুলি বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটেছে লাইনচ্যুত হওয়ার ফলে। স্বাধীনতার পর থেকে ভারতীয় রেল অন্যান্য বিষয়ে নজর দিলেও এই বিষয়টি দুয়োরানির মতো অবহেলিত থেকে গেছে। ট্র্যাকের পরিবর্তন ও পরিমার্জন না ঘটিয়ে পূর্বতন রেলমন্ত্রীরা প্রত্যেক বার রেল বাজেটে একের পর এক চমক প্রদর্শন করে গেছেন। নব্বই

দশকের শুরু থেকে লালুপ্রসাদ যাদব, নীতীশ কুমার যাদব, রামবিলাস পাসোয়ান, মমতা ব্যানার্জী-সহ রেল মন্ত্রীরা নতুন নতুন একগুচ্ছ ট্রেন চালু করে গেছেন। সবটাই নিজেদের রাজ্যে ভোটের কথা চিন্তা করে প্রাদেশিক রেল বাজেট পেশ করেছেন। প্রদেশের ঊর্ধ্বে উঠে কেউ আর দেশের কথা ভাবেননি। চমক বলতে যা বোঝায় তার সবটাই উপস্থিত ছিল তাঁদের বাজেটে। সংসদে বিরোধিতা থাকলেও সেভাবে তা দানা বাধেনি। প্রায় ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে সেভাবে রেলের ভাড়া বৃদ্ধি পায়নি। ভারতীয় রেল চলছিল ক্ষতিতে।

আর প্রত্যেক বাজেটেই অর্থ দপ্তর থেকে টাকা নিতে হয়েছে। তৃণমূলের সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদী যখন রেলমন্ত্রী হলেন, তিনি রেল ভাড়া বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করলেন। বললেন ভাড়া বৃদ্ধি না করলে রেল লোকসানে চলবে। কিন্তু পরবর্তীতে দীনেশ ত্রিবেদী নোংরা ও সস্তা রাজনীতির শিকার হলেন। তাঁকে সরিয়ে রেলমন্ত্রী করা হলো মুকুল রায়কে। যিনি পুনরায় বর্ধিত ভাড়া কমিয়ে দিলেন। দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ভারতীয় রেলের ভাড়া বৃদ্ধি করলে এতদিনে রেলের খোলনলচের বদল ঘটানো সম্ভব ছিল। প্রতিবছর ভারতীয় রেলকে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হতো না। এর জন্য দায়ী এইসব নেতা-নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্টতা। রেল চলাচলের জন্য আধুনিক ও উন্নতমানের রেললাইন ও বগি প্রয়োজন। যাতে যাত্রীরা সুরক্ষিত থাকেন ও ভালভাবে যাতায়াত করতে পারেন।

২০১৪ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি ক্ষমতায় আসার পর প্রথম যে কাজটা করল, রেল দপ্তরকে অর্থ দপ্তরের অধীনে নিয়ে এল। কারণ এতদিন ভারতীয় রেল স্বাধীনভাবে চলছিল। এবং তার ফল কী হয়েছে সকলেই তা দেখেছে। পরপর দুটো বাজেটে সেভাবে নতুন ট্রেনের সংখ্যা না বাড়িয়ে রেল লাইনের সংস্কারের কাজে হাত লাগাল। ভারতের দীর্ঘ অংশ জুড়ে নতুন রেললাইন পাতার কাজ শুরু হলো। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আগরতলা থেকে লামডিং পর্যন্ত মিটার গ্রেজ লাইন

তৎকালীন রেলমন্ত্রী সুরেশ প্রভু

সরিয়ে ব্রডগেজ লাইন বসানো। এছাড়া আগরতলা থেকে মিজোরাম পর্যন্ত লাইন তৈরির কাজ চলছে। অরুণাচলে লাইন বসানোর কাজ শুরুর পথে। এমন আরও কত উদাহরণ রয়েছে যার প্রচার সেভাবে হয়নি। অথচ কাজ চলছে।

সিগন্যাল ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ঘটিয়ে বেশকিছু সিগন্যালকে স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে। প্রহরাবিহীন লেভেল ক্রসিংয়ের সংখ্যা কমানো হয়েছে। এতে হতাহতের সংখ্যা অনেকটা কমবে। কুয়াশায় সামনের অস্পষ্টতা কাটানোর জন্য উন্নতমানের এল.ই.ডি হেডলাইট বসানো হয়েছে। এর ফলে আগের থেকে সমস্যা কম হচ্ছে। উন্নত প্রযুক্তির কোচ তৈরি হচ্ছে। যাত্রীরা এখন আগের থেকেও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। দ্রুত যাতায়াতের জন্য বুলেট ট্রেন বা এই জাতীয় ট্রেন তৈরি করা হচ্ছে। এই জাতীয় ট্রেন চলাচলের জন্য আলাদা লাইন পাতা হচ্ছে। এরফলে যাতায়াতের সময় একলাফে অনেকটা কমে যাবে। ভাবুন তো দিল্লি থেকে বারাণসী মাত্র ২ ঘন্টায় পৌঁছে যাবে। দিল্লি থেকে কলকাতা যেতে সময় লাগবে মাত্র ৫.৫ ঘন্টা। এতকিছুর পরেও বিরোধীরা বলবে কোনো কাজ হয়নি। শুধু বলেই ক্ষান্ত নয়। এইসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের স্বার্থান্বেষী মিডিয়া লেলিয়ে দিল সাধারণ মানুষের মধ্যে রেল ব্যবস্থা নিয়ে বিভ্রান্তমূলক ধারণা তৈরির উদ্দেশ্যে। নীচে ২০০৯–২০১০ থেকে ২০১৪–২০১৫ পর্যন্ত কয়েকটি ট্রেন দুর্ঘটনার বিবরণ দেওয়া হল :

(ক) দুটো ট্রেনের মুখোমুখি সংঘর্ষ জনিত দুর্ঘটনা ৩৮, (খ) লাইনচ্যুতি সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ৩৭৩, (গ) লেভেল ক্রসিং সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ৩৯৯, (ঘ) ট্রেনে আগুন লাগা সংক্রান্ত দুর্ঘটনা ২৯, (ঙ) অন্যান্য দুর্ঘটনা ১৪।

একটা বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, প্রত্যেক বছর এই দুর্ঘটনার সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান। বর্তমানে এই সংখ্যাটা আরও কমেছে। এর কারণ হিসেবে বলা যায় ভারতীয় রেল ব্যবস্থায় অনেক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে। পরিশেষে একটাই কথা বলা যায় সবুরে মেওয়া ফলে। আগামী ১০ বছরে ভারতীয় রেলে অনেক উন্নয়ন হবে। যার সুফল আগামীদিনে ভোগ করব আমরা।

২০১৭ সালের কয়েকটি ট্রেন দুর্ঘটনা

তারিখ	ট্রেনের নাম	দুর্ঘটনা স্থল	দুর্ঘটনার কারণ	ক্ষয়ক্ষতি
২১/০১/১৭	হিরাকুদ এক্সপ্রেস	কাউনেরু, বিজয়নগরম	লাইনচ্যুত	নিহত ৪১ জন, আহত ৬৮ জন
১৫/০৪/১৭	রাজারানি এক্সপ্রেস	রামপুর	লাইনচ্যুত	আহত ২৪ জন
১৯/০৮/১৭	কলিঙ্গ উৎকল এক্সপ্রেস	খাটাউলি, মুজফ্‌ফরনগর	লাইনচ্যুত	নিহত ২৩ জন, আহত ৯৭ জন
২৩/০৮/১৭	কৈফিয়ত এক্সপ্রেস	পাটা ও অকালদা স্টেশনের মাঝে	লাইনচ্যুত	আহত ১০০ জন
১৪/০৯/১৭	জম্মু রাজধানী	নিউ দিল্লি স্টেশনের কাছে	লাইনচ্যুত	হতাহত শূন্য

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

রাহুল আগে বড় হন তারপর রাজনীতি করবেন

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

দেশের মানুষ যদি ভোট দিয়ে তাঁকে ক্ষমতায় ফেরান, তাহলে ছ' মাসের ভিতর সমস্ত সমস্যার আমূল সমাধান করে দেবেন তিনি। এমন দাবি করেছেন রাহুল গান্ধী। রাহুল গান্ধীর হাতে কী জাদুদণ্ড আছে, তা দেশের মানুষের জানা নেই। কোন জাদুদণ্ডের জোরে ক্ষমতা হাতে পেলে মাত্র ছ-মাসের মধ্যেই সত্তর বছরের জমে থাকা সমস্যার সমাধান এক লহমায় করে দেবেন— তাও দেশের মানুষ জানেন না। তবে, দেশের মানুষ এই ভেবে চিন্তিত হতে পারেন— শতবর্ষ প্রাচীন একটি রাজনৈতিক দলের সর্বভারতীয় সভাপতির পদে বৃত হতে চলেছেন এমন এক ব্যক্তি (চল্লিশের কোঠা পেরিয়ে যাওয়া এই ব্যক্তিটিকে এখন আর নিতান্ত বালক অথবা কিশোর বলা যায় না) এইরকম একটি অবিবেচনাপ্রসূত ছেলেমানুষী মন্তব্য করেছেন। এরকম একটি মন্তব্য শুনে দেশের মানুষ ভাবিত হতে পারেন যে, এমন অপরিণত মস্তিষ্ক একজন ব্যক্তির হাতে শতবর্ষের প্রাচীন রাজনৈতিক দলটির দায়িত্ব পড়লে দলটির কী অবস্থা হতে পারে! এমনকী এ ভেবেও আশঙ্কিত হতে পারেন, যদি কপালজোরে এই অপরিণতমনস্ক ব্যক্তিটির হাতে কোনোদিন সরকারি ক্ষমতা এসে পড়ে (যার সম্ভাবনা খুবই কম) তাহলে এই দেশটির কী দুর্দশা হতে পারে।

কংগ্রেসের ভাবী সভাপতি রাহুল গান্ধীর এই অবাস্তব দাবির পরে স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন উঠবে যে, তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কতখানি? কোনো আন্দোলনের ভিতর দিয়ে রাহুল গান্ধী নিজেকে রাজনৈতিক নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা করেননি। কোনো দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক

প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তিনি নিজেকে একজন নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন— এমন শোনা যায়নি। শুধুমাত্র গান্ধী পরিবারের সন্তান হওয়ার জন্য কংগ্রেসের নেতৃত্বে তাঁর উত্থান। তাঁর নামের পিছনে যদি গান্ধী পদবিটি না থাকত, রাজীব গান্ধী এবং ইন্দিরা গান্ধী যদি তাঁর পিতা এবং পিতামহী না হতেন— তাহলে দিল্লির কনটপ্লেসের রাস্তায় রাহুল গান্ধীকে আর পাঁচ পাবলিকের মতোই ঘুরে বেড়াতে হোত। কিন্তু সমস্যা হলো কংগ্রেস দলে কেউ এই প্রশ্ন তোলে না। কেউ প্রশ্ন তোলে না, রাজনৈতিক পরীক্ষায় বারবার ব্যর্থ হওয়া এমন অপরিপক্ক এক ব্যক্তিকে সোনিয়া গান্ধী কেন দলের পরবর্তী সভাপতি হিসেবে মনোনীত করছেন? করেন না, কারণ, কংগ্রেসের দাস মনোভাব সম্পন্ন নেতাদের অপদার্থতা এবং হীনমন্যতার কারণেই এই দলটি এখন নেহরু-গান্ধী পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু দেশের মানুষের কোনো দায় নেই রাহুল গান্ধীকে নেতা হিসেবে মেনে নেওয়ার। তা তারা পরপর কয়েকটি নির্বাচনে বুঝিয়েও দিয়েছেন।

রাহুল গান্ধীর মূল আক্রোশটি যে নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর বিরুদ্ধে তা এখন আর কারো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। অতিরিক্ত আক্রোশে অনেক সময়ই ণত্বষত্বজ্ঞান হারিয়ে ফেলে মানুষ। রাহুল গান্ধীর হয়েছে এখন সেই দশা। নরেন্দ্র মোদী এদেশে প্রধানমন্ত্রিত্বের দায়িত্বে আছেন। তিন বছর তাঁর কার্যকাল পুরো হতে এখনও দু-বছর বাকি। তার আগে দীর্ঘ সাত দশক, অটলবিহারী বাজপেয়ির শাসনকালের পাঁচবছর বাদ দিলে, প্রায় পুরো সময়টাই কেন্দ্রে ছিল অবিজেপি সরকার। এর ভিতর আবার অধিকাংশ সময়টাই ক্ষমতায় ছিল কংগ্রেস। নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার অব্যবহিত পূর্বের দশ বছরই মনমোহন সিংহের প্রধানমন্ত্রিত্বে ক্ষমতায় ছিল সোনিয়া-রাহুলের কংগ্রেস। এখন মাত্র তিন বছর বয়সি একটি সরকারের দিকে আঙুল তুলে যদি রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেন— দেশের সব সমস্যার জন্য মোদীই দায়ী— তাহলে এ প্রশ্নও উঠবে, বিগত সাত দশকে এই দেশটি কি সমস্যা মুক্ত ছিল? অত বেশি দিনের কথা যদি বাদই দিই--- মনমোহন সিংহের শাসনকালের দশবছরে কংগ্রেস কি দেশের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পেরেছিল? গত সাত দশকে দেশের ভিতরে যে সমস্যার পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে— কাশ্মীর থেকে মৌলবাদ, দারিদ্র্য থেকে বেকারি— যে সমস্যার অধিকাংশই সৃষ্ট হয়েছে পূর্বতন কংগ্রেস সরকারগুলির আমলে— তা যে মাত্র তিন বছরের ভিতর এক লহমায় সমাধান করে ফেলা সম্ভব নয়— তা বোঝার জন্য খুব বেশি বুদ্ধিমান হওয়ার দরকার নেই। নরেন্দ্র মোদী তাঁর কার্যকালের সম্পূর্ণ মেয়াদটি পূরণ করার পর যদি রাহুল গান্ধী হিসেবনিকেশ করতে বসতেন— তাহলে ভালো করতেন। এই তিনবছরের ভিতর তিনি যে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন— এমন দাবি নরেন্দ্র মোদীও করেন না। দেশের ভিতরে এখনও এমন কিছু সমস্যা আছে, যা সমাধানে সরকারকে আরও সক্রিয় হতে হবে। কিন্তু যা লক্ষ্য করার বিষয়, তা হলো সমস্যাগুলিকে সরকার কীভাবে চিহ্নিত করতে পারছে এবং তার সমাধানে কতখানি আন্তরিকতা দেখাচ্ছে সরকার। রাহুল এবং তাঁর পরিবারের পারিষদবর্গ যাই বলুন না কেন--- সত্তর বছরের জমে থাকা অনেক সমস্যাই মোদী সরকার যথাযথ চিহ্নিত করতে পেরেছে এবং সেই সমস্যাগুলির সমাধানের লক্ষ্যে

পদক্ষেপও নিতে শুরু করেছে।

রাহুল স্বীকার করুন কী না করুন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর আমলে চালু হওয়া জনধন প্রকল্প সমাজের একদম নীচুতলার মানুষগুলিকে 'স্বাধিকারে'র সন্ধান দিতে পেরেছে। সম্প্রতি একটি জাতীয় স্তরের সমীক্ষায় তার নমুনাগুলি ধরাও পড়েছে। একটি উদাহরণ দিই। উত্তরাখণ্ডের নাওয়ার খেতা গ্রামের বাসিন্দা একটি ছোট মুদি দোকানের মালিক রমাদেবী প্রকাশ চন্দ্র। তিন সন্তানের জননী এই মহিলার কোনো ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিল না। মাসিক আয় ছিল ৫ হাজার টাকা। জনধন প্রকল্পে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার পর এই মহিলা বলেছেন— 'আমি এখন স্বাধিকারের মর্ম বুঝতে পারি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি অনেককেই এই প্রকল্পে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে উৎসাহিত করেছি।' তেমনি মুদ্রা প্রকল্পেও দেশের দরিদ্র পরিবারগুলির মুখে হাসি ফোটাতে সফল হয়েছে মোদী সরকার। সাম্প্রতিক ওই জাতীয় স্তরের সমীক্ষাটি থেকে আর একটি উদাহরণ তুলে দিচ্ছি। পঞ্জাবের ফরিদাকোট গ্রামের বাসিন্দা সুরজিৎ সিংহ দৈনিক চুক্তির ভিত্তিতে ছুতোরের কাজ করেন। তাঁর মাসিক আয় ছিল ২০০০ টাকার মতো। মুদ্রা প্রকল্পের ফলে এখন নিজের ব্যবসায় তিনি মাসে ১৫০০০ টাকা আয় করেন। মুদ্রা প্রকল্পের ৫০ হাজার টাকার ঋণই তাঁর জীবনযাত্রা পাল্টে দিয়েছে। গান্ধী পরিবারের সন্তান রাহুল গান্ধী এই ভারতকে চেনেননি; দেখেননি কখনো এই ভারতকে। গরিব কৃষকের ঘরে খাটিয়ায় বসে ছবি তুলেছেন প্রচারের আলোয় থাকতে। মোদীর সাফল্য এখানেই যে গরিব কৃষকের ঘরের খাটিয়ায় বসে ছবি না তুলেও, তিনি পৌঁছতে পেরেছেন গরিবের ঘরে। রমাদেবী বা গুরুজিৎ সিংহের মতো অসংখ্য মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। রাহুল একটু ভেবে বলুন না--- নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ঠিক আগের দশটি বছরে মনমোহন সিংহের সরকারের আমলে এমন প্রকল্প কটা চালু করতে পেরেছিলেন তাঁরা? রাহুল যেন ভুলে না যান, মনমোহন সিংহের দশ বছরের শাসনকালে কংগ্রেস একাধিক দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হয়েছিল। এই দুর্নীতি থেকে বাদ যায়নি তাঁর পরিবারও।

নরেন্দ্র মোদী হচ্ছেন প্রথম ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী, তিনি লুটিয়েন দিল্লির প্রাচুর্য থেকে বেরিয়ে এসে প্রান্তিক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বুঝতে শিখেছেন। গ্রামের মহিলাদের লজ্জা নিবারণের জন্য প্রতি গ্রামে শৌচালয় নির্মাণ যে জরুরি— এই সত্যটিকে পূর্বতন প্রধানমন্ত্রীরা না বুঝলেও মোদী বুঝেছেন। বুঝেছেন সুলভে গ্রামীণ মহিলাদের রান্নাঘরে গ্যাসের সিলিন্ডার পৌঁছে দেওয়া কত জরুরি। মোদী হচ্ছেন সেই প্রধানমন্ত্রী, তিনি সস্তা চটুল জনপ্রিয়তার রাজনীতিতে আস্থা না রেখে উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের আগেই নোটবন্দির মতো সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছেন। দেশে এক অভিন্ন কর কাঠামো চালু করতে জিএসটি কার্যকর করেছেন। এর সুফল যে দেশের মানুষ বুঝছে না এমনও নয়। রাহুল এবং তাঁর পরিষদরা যতই 'গেল গেল' রব তুলে চিৎকার করুন না কেন; এইসব কঠোর সংস্কারমূলক সিদ্ধান্তের পরেও কিন্তু বিভিন্ন রাজ্যে বিজেপির বিজয়কে ঠেকানো যায়নি। যে কোনো সংস্কারমূলক পদক্ষেপের সুফল যে চটজলদি মেলে না, তা মিলতে কিছুটা যে সময় লাগে--- যে কোনো অর্থনীতিবিদের সঙ্গে আলোচনা করলেই রাহুল সে পাঠটি নিতে পারেন। তা না নিয়ে অযথা হই-চই করে লাভ কী!

দেশের অভ্যন্তরে মোদীর এই কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মোদীর সাফল্যেও রাহুল ঈর্ষান্বিত হতে পারেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা এখন একবাক্যে স্বীকার করছেন, মাত্র তিনবছরের ভিতরই মোদী ভারতের বিদেশ নীতিতে এমন একটি পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন, যার ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে, পাশ্চাত্যের শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি ভারতকে সমীহের জায়গায় বসাতে বাধ্য হয়েছে। ইজরায়েলের মতো ভারতের স্বাভাবিক মিত্রর সঙ্গে মোদীর আমলেই সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গেও সম্পর্কে উন্নতি করেছে ভারত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত এখন তার পাশে পেয়েছে অনেক বন্ধুকে। ঠিক, মোদীর তিন বছরের শাসনকালে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায়নি। অনেক সমস্যার সমাধান এখনও বাকি রয়ে গিয়েছে। কিন্তু তিন বছরে মোদী যে কাজটি করেছেন তা হলো, ঘরের ভিতর গত সত্তর বছরে যে ময়লাগুলি জমা হয়েছে, সেই ময়লা সাফ করে সত্যিই একটি স্বচ্ছ ভারত গড়ার কাজে মনোনিবেশ করেছেন। যা এতদিন কেউই করেননি।

ভারতবর্ষ বরাবর মাতৃশক্তিকে পূজা করেছে, তাঁকে সম্মান করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলে গিয়েছিলেন— 'এই দেশ সীতা-সাবিত্রীর দেশ। মাতৃশক্তির উত্থান ছাড়া এই দেশের উন্নতি সম্ভব নয়।' নরেন্দ্র মোদী সেই প্রধানমন্ত্রী যিনি মাতৃশক্তির প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা জানাতে পেরেছেন। নারীর অধিকার এবং মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। মুসলমান মহিলাদের বঞ্চনা, অত্যাচার থেকে রক্ষা করে তাদের অধিকার এবং মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি পূর্বতন কোনো প্রধানমন্ত্রীই গুরুত্ব দিয়ে ভাবেননি। ভেবেছেন একমাত্র নরেন্দ্র মোদী। তিন তালাকের মতো একটি বর্বর, অমানবিক প্রথা বিলোপের কথা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনিই প্রথম বলেছেন। এবং তাঁর এই শাসনকালেই তিন তালাককে অসাংবিধানিক ঘোষণা করা হয়েছে। দু' হাত তুলে নরেন্দ্র মোদীকে আশীর্বাদ করেছেন এতদিন বঞ্চনার শিকার হওয়া মুসলমান মহিলারা।

আর বিপরীতে রাহুল গান্ধী? মাতৃশক্তির প্রতি চরম অবমাননাকর অসম্মানসূচক মন্তব্যটি তিনিই করে বসেছেন। বলেছেন— 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘে আপনারা কখনও হাফ প্যান্ট পরা মহিলা দেখেছেন? রাহুল গান্ধী নারী প্রগতি বলতে শুধু হাফপ্যান্ট পরাই বুঝেছেন। নারীকে যাঁরা ভোগ করবার সামগ্রী হিসেবে দেখেন— তারাই শুধু এরকম ভাবতে পারেন। ভারতীয় সংস্কৃতি নারীকে এই চোখে দেখে না। বোঝাই যায়, ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এই ইতালিয় রমণীর পুত্রের কোনোই যোগসূত্র নেই। তদুপরি, রাহুল গান্ধী এও জানেন না, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নারী শাখাটির নাম রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি। ভারতীয় নারী সমাজকে এমন নীচু চোখে তিনি দেখেন— তাঁর কাছ থেকে দেশ কী আশা করবে?

রাহুলের বড় হওয়া এখনও অনেক বাকি। আগে তিনি বড় হোন, তারপর না হয় রাজনীতি করবেন। ■

রাহুল বচনামৃত

সোহম মিত্র

কংগ্রেসের ভাবী সর্বভারতীয় সভাপতি রাহুল গান্ধী প্রায়ই নানা বিষয়ে কথা বলেন। অনেকের ধারণা বাজে বকেন। অনেকবার বচনের গেরো সামলাতে না পেরে ডিগবাজি খেয়েছেন। সব থেকে বড়ো ডিগবাজি সম্ভবত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ এবং গান্ধীহত্যার মধ্যে সমীকরণ নিয়ে। রাহুল বলেছিলেন, 'সঙ্ঘই গান্ধীজীর হত্যার জন্য দায়ী। সেইজন্যেই সঙ্ঘের রাজনৈতিক মুখ বিজেপি সেই হত্যাকারীকে এত উচ্চ আসন দেয়। অথচ ওরা সর্দার প্যাটেল এবং গান্ধীজীর বিরোধিতা করে।' এই মন্তব্য করার পর রাহুল হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলেন ইতিহাস বিকৃত করলে কী হয়! কিছুদিন পরেই সুপ্রিম কোর্টে তাকে বলতে হয়েছিল, 'না, আমি ঠিক ওভাবে বলতে চাইনি। যিনি হত্যা করেছিলেন তিনি সঙ্ঘের আদর্শে বিশ্বাস করতেন। তার জন্য সামগ্রিকভাবে সঙ্ঘকে দায়ী করা আমার ঠিক হয়নি।'

এই নিবন্ধে রাহুল গান্ধীর এরকমই কিছু শিশুসুলভ মন্তব্য তুলে দেওয়া হলো—

জুলাই, ২০১১ : আমরা ৯৯ শতাংশ সন্ত্রাস বন্ধ করতে পারব। বাকি ১ শতাংশ চলতে থাকবে। ওটা বন্ধ করা যাবে না।

মুম্বইয়ে সিরিয়াল ব্লাস্টের পর।

জানুয়ারি, ২০১৩ : কংগ্রেস একটা মজার দল। পৃথিবীর বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কিন্তু কোনওরকম নিয়ম-টিয়মের ধার ধারে না। আমরা প্রত্যেক মিনিটে নিয়ম বানাই, আবার নিজেরাই সেসব আস্তাকুঁড়ে পাঠিয়ে দিই।

জয়পুরে এ আই সি সি-র বৈঠকে।

আগস্ট ২০১৩ : চীন হলো ড্রাগন। ভারতকে বলা হয় হাতী। কিন্তু হাতী না বলে ভারতকে মৌচাক বলা উচিত। সারাক্ষণ এখানে সবাই মাছির মতো ভনভন করছে।

এক ইংরেজি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে।

আগস্ট ২০১৩ : গরিবি মনের একটি সমস্যা। এর মানে এই নয় যে দেশে খাবার নেই। কিংবা টাকাপয়সার কোনও অভাব আছে। কেউ যদি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হয় গরিবিকে অতিক্রম করা কোনও ব্যাপারই নয়।

এলাহাবাদে এক বিতর্ক সভায়।

প্রতিক্রিয়া :

(১) এই মন্তব্য গরিবদের অপমান।

বিজয়বাহাদুর পাঠক, বিজেপি।

(২) উনি কোটিপতি পরিবারের সন্তান। গান্ধী-নেহরু পরিবারের কেউ দূর থেকেও কোনওদিন গরিবি দেখেননি।

নাসিমুদ্দিন সিদ্দিকি, বহুজন সমাজ পার্টি।

রাহুল এখন আমজনতার হাসির খোরাক

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতি বিষয়ক দপ্তরের প্রধান সচিব এস সি গর্গ ১৮ অক্টোবর জানিয়েছেন তাঁর তথ্য ও বিশ্লেষণ অনুযায়ী জুলাই মাসে লাগু হওয়া GST বিলের সাময়িক নেতিবাচক অভিঘাত কেটে গেছে। প্রমাণ স্বরূপ উৎপাদন ক্ষেত্রে আগস্ট মাসেই ৩.১ শতাংশ বৃদ্ধি নজরে পড়েছে। মূলধনি দ্রব্য ও বৈদুতিন যন্ত্রপাতি বিক্রির ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি হয়েছে। এ গেল দেশীয় প্রতিবেদন।

১৬ অক্টোবরের টাইমস অব ইন্ডিয়ায় IMF প্রধান ক্রিস্টিন লাগার্ডের বক্তব্য ''We have slightly downgraded India (6.7% from 7.2% for 17–18) ..... but India is on a growth track that is much more solid as a result of the structural reforms conducted in the last few years''. এখানে Banking ও অন্যান্য ক্ষেত্রে দেউলিয়া বিল, জি এস টির মতো ৪০টি অক্টোপাসের কায়দায় ঘিরে ধরা বিচিত্র চরিত্রের করকে এক ধাক্কায় বাতিল করে দেশব্যাপী 'এক কর ব্যবস্থা' চালু বা বিমুদ্রীকরণের মতো দুঃসাহসিক পদক্ষেপকেই যে বোঝানো হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই ধরনের দীর্ঘমেয়াদি অচলায়তন ভাঙা সংস্কারে যে দেশবাসী খুশি তারও তথ্য পাওয়া গেছে। না তা বিজেপির নির্বাচনী সভায় নয়। মিলেছে ওয়াশিংটনে অবস্থিত সুপরিচিত আন্তর্জাতিক সংস্থা 'নিউ রিসার্চ সেন্টারের' গবেষণায়। তাঁরা জানিয়েছেন ভারতের প্রতি ৫ জন নাগরিকের মধ্যে ৪ জন নাগরিক এই সরকারের ওপর পূর্ণ আস্থাশীল। নাগরিকদের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ওপরই এই সমীক্ষা চালানো হয়। সমীক্ষা অনুযায়ী ২০১২ সালের তুলনায় দেশের অর্থনীতি গড়ে ৬.৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা আরও ঊর্ধ্বমুখী।

হায়! আমাদের পাপ্পু এসব দেখতে, শুনতে, পড়তে নিশ্চয় পারেন না। বা হয়তো দেখেন কিন্তু মস্তিস্কের উর্বর কোষের কোনো অর্ণিনীত প্রতিবন্ধকতায় তার মর্ম উদ্ধার করতে পারেন না। এই পাপ্পু অর্থাৎ প্রধামন্ত্রীপদ প্রত্যাশী পারিবারিক কংগ্রেস দলের রাহুল গান্ধী হঠাৎ গুজরাটে গিয়ে হুল্লোড় করছেন GST-র ফলে দেশের সর্বনাশ হয়ে গেল। তিনি মার্কিন মুলুকে প্রাজ্ঞ লোকেদের সভায় তাঁর মনোবেদনা ব্যক্ত করে বলেছেন, ভারতে তো বহু পারিবারিক দলই শাসন চালাচ্ছে অর্থাৎ সমাজবাদী, আর জে ডি ইত্যাদি দলের কথা বুঝিয়েছেন। শুধু তাঁর পরিবারকে দায়ী করাটাই তাঁর আক্ষেপের কারণ। তিনি অজান্তে দেশকে কত নীচে নামিয়ে দিলেন! তিনি এযাবৎ তাঁর পারিবারিক উদ্যোগে চলা দলকে কোনো জয়ই এনে দিতে পারেননি। রাজ্যে রাজ্যে হারতে হারতে তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। বর্তমানে বিজেপি যে ১৮টি রাজ্যে একক বা জোট সরকার চালাচ্ছে আর কংগ্রেস মাত্র পঞ্জাব, কর্ণাটক, হিমাচল এই তিনটি রাজ্যে টিকে আছে তা এই পাপ্পু বিস্মৃত হন। মানুষ শিশু বয়স থেকে পরিবারের মধ্যে থেকে যা শেখে তাই সে আমৃত্যু বহন করে চলে। তিনি তো দেখেছেন তাঁর মা রোমান হরফে লেখা হিন্দি ভাষণ পড়েন। দশ বছর আগে অবধি বছরের একটা বড় অংশ তাদের পরিবার বিদেশে থাকতো। তিনিও সে অভ্যাস কাটিয়ে উঠতে পরেননি। তাই পরাধীন ভারতে উচ্চশিক্ষা প্রার্থী গান্ধী, নেহেরু, প্যাটেল, জিন্না— যাঁরাই বিদেশে গেছেন, (নেতাজী এখানে ধর্তব্যের মধ্যে নয়।) তাঁদের সবাইকে NRI বানিয়ে দিয়েছেন। তিনি নিশ্চিতভাবেই নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ানের সঠিক সংজ্ঞা সম্পর্কে অজ্ঞ। তাঁর অন্য সাম্প্রতিক বালখিল্য আচরণ সম্পর্কে পরে আসছি।

শুধু এই পাপ্পুর প্রশংসা করতে গিয়ে মিরাট জেলা কংগ্রেসের প্রবীণ সভাপতি বিনয় প্রধান সম্প্রতি তাঁর পদ খুইয়েছেন। অথচ তাঁর (পাপ্পুর) এই ৪৯ বছর বয়সে রাজনৈতিক উৎকর্ষতার শীর্ষে না হোক অন্তত বেশ কিছুটা উচ্চধাপে থাকাজনিত

সমীহ আদায় করার কথা। হয়তো কেউই তাঁকে তা করে না। তিনি যে সেটা বোঝেন না তা নয়, তাইতো কালাকে কালা, কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া বলার অপরাধে জেলা সভাপতির চাকরি গেল।

এই পাপ্পু কিন্তু আজও বিধ্বংসী সম্ভবনাময়। গত নির্বাচনে নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হলেও এই তো সেদিন প্রায় কাঁপিয়ে দিচ্ছিলেন। মোদীর রাজ্য গুজরাটে ২০০১ সালে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পে প্রায় বিশ হাজারের মতো প্রাণহানি হয়েছিল। বহু লক্ষ বাড়িঘর ধূলিসাৎ হয়ে যায়। পাপ্পু অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে তারই Replica আমাদের মহামান্য সংসদ ভবনে হাজির করার মতো চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন। পাঠক নিশ্চয় ভুলে যাননি একটি অকিঞ্চিৎকর ডায়েরির ক'টি ছেঁড়া পাতায় কটি সংক্ষিপ্ত নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে তাঁর হুঙ্কার। আদালত পূর্বেই যা অগ্রাহ্য করেছে তাই নিয়ে সংসদ চত্বরে হুমকি দিলেন "ম্যঁয় যব মু খুলুঙ্গা তব ভূকম্প আ যায় গা।" মানে প্রধানমন্ত্রীর কেলেঙ্কারি ফাঁস করবেন। যাই হোক্, আমাদের সংসদ শক্তপোক্ত। ২০০১-এ অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ থেকে বীর রক্ষীরা প্রাণ দিয়ে সংসদভবন রক্ষা করেছেন। এবারও পাপ্পুর ভূকম্পের হাত থেকে দেশবাসী নিজ সৌভাগ্যে বেঁচেছে। বিমুদ্রীকরণের সময়ও পাপ্পু এমনই চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। আর এক মতলবি কেজরিওয়াল, দিদিভাই ও অন্যকিছু দাগি পল্টন নিয়ে সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন। অথচ অতি সম্প্রতি তিনি বলেছেন জিএসটি'তে কংগ্রেসেরও ভূমিকা আছে—এটি দেশের পক্ষে ভাল। আরে এই বিলটি তো সর্বসম্মতিতে অনুমোদিত হয়েছে।

বিশেষ বিশেষ ঘটনা পরম্পরায় অনেক সময় কম মানসিক ধৈর্যের লোকজনের মধ্যে অস্থিরতা প্রকাশ পায়। স্বাভাবিকভাবে নির্বাচন কাছাকাছি এলে পাপ্পুর মধ্যেও এমনই অস্থিরতা দেখা দেয়। মোদীজী একে বলেছিলেন বালখিল্যতা। আগে বলা অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানগুলিকে নস্যাৎ করে ঠিক যেমন তিনি মনমোহন মন্ত্রীসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের অধ্যাদেশকে অবলীলায় আঁস্তাকুড়ে ফেলে দেবার অশ্লীল বালখিল্যতা দেখিয়েছিলেন তেমনই গুজরাতের উন্নয়ন সম্পর্কে বলেছেন "বিকাশ পাগলায়া গায়া।" এই হিন্দি বাক্যটির সঠিক অর্থ অত্যন্ত গর্হিত বলেই জানা যাচ্ছে। এটি খানিকটা তাঁর মাতৃসূত্রে উত্তরাধিকার, যিনি মোদীকে গুজরাতে গিয়ে 'মওত কা সওদাগর' বলে নির্বাচনে চরম হেনস্তা হয়েছিলেন।

পাপ্পুর যাওয়ার কিছু পরেই বিজেপি সভাপতি শাহ ও তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি আমেথি যান। যেখানে পাপ্পুর নিকম্মাগিরির অজস্র ঘটনা তাঁর নির্বাচনী

কেন্দ্রের মানুষজনের কাছে তাঁরা শোনেন। এর পর শাহ-মোদী জুটি নিজ রাজ্য গুজরাটে গেলে মিডিয়ায় ধ্বনি ওঠে পাপ্পু যাওয়ার পর এঁরা ভয় পেয়ে এখানেই পড়ে থাকবেন। পাঠকের মনে পড়বে মিডিয়ার ঘোষিত কোজরিওয়ালের কাল্পনিক ভয়ে ২০১৪ সালে মোদীর তিন দিন বেনারসে অবস্থান। ফল মোদীর ৩.৩৭ লক্ষ ভোটে জয় আর উত্তর প্রদেশে রেকর্ড ৭৩টি আসন। কেজারিওয়ালের কাপড়চোপড় অবিন্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। গুজরাটের নির্বাচনী বিশেষজ্ঞরা বলছেন তিনটি বিধানসভা নির্বাচন অর্থাৎ ১৫ বছর ধরেই নির্বাচনের আগে ধূয়ো ওঠে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা ঠিক করছে। ফলের দিন বিজেপির বিজয় মিছিল বেরোয়। ন্যাশানাল হেরাল্ড মামলায় কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে যুগ্ম জামিনে ছাড়া পাওয়া পাপ্পু আবার গুজরাতে ক্ষমতা দখলে বেরিয়েই স্মৃতি ইরানিকে ব্যক্তিগত নিম্নরুচির আক্রমণ করেছেন (যেটি অবশ্য কোন বাজারি কবির পঙক্তি)। ছাড়ার পাত্র নন স্মৃতি। তিনি তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে জানিয়েছেন "ইয়ে সত্তাকে ভুক সবুর কর, আঁকড়ে সাথ নেহী তো কেয়া, খুদগর্জোকো জমা করো আউর দেশকা বদনামী কা শোর তো মচায়ে"। গদির খিদে ষোল আনা থাকলেও অপেক্ষা কর, সঙ্গে প্রয়োজনীয় সংখ্যা না থাকলে কী হয়েছে, স্বার্থপর লোকগুলোকে একজোট করে বিদেশে দেশের বদনাম করার কাজটা হি হি করে চালিয়ে যাও।

এরই মধ্যে পাপ্পুর কেদাক্ত জামাইবাবু দেশ থেকে বেপাত্তা হয়ে যাওয়া ইডির জালে পড়া অস্ত্র ব্যবসায়ী সঞ্জয় ভাণ্ডারীর পয়সায় বেআইনি অফারে স্বর্গরাজ্য জুরিখে ঘুরে এসেছেন বলে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। যে সে নয়, এ ব্যাপারে দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নির্মলা সীতারমন পাপ্পুর দলের কৈফিয়ত দাবি করেছেন। বিষয়টা কিন্তু দেশের নিরাপত্তার। এর সঙ্গে মানি লন্ডারিং-এর মতো অপরাধ জড়িত। দেশের মূল বিরোধী দলের হবু সভাপতি পাপ্পু যদি একটুও বুঝত! ■

এই সময়

মোনালিসার গোঁফ

এই না হলে আইডিয়া! মার্সেল ডু স্যাম্প পেন্সিল দিয়ে মোনালিসার গোঁফ এবং চিবুকে

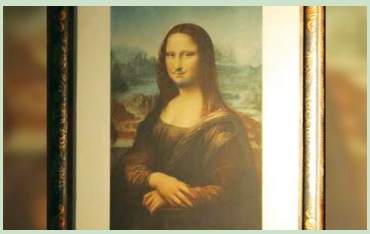

সামান্য দাড়ি এঁকে দিয়েছিলেন। সেই কিম্ভুতকিমাকার ছবি প্যারিসের নিলামে বিক্রি হয়েছে ৬৩২,৫০০ ইউরোয়। ভাবা যায়!

হেঁটে আসুন

আপনাকে কি সারাদিন অফিসে বসে কাজ করতে হয়? ভারতে হলে কোনও অসুবিধে

নেই। কিন্তু ফিলিপিনস সরকার নতুন নিয়ম বের করেছে। একটানা বসে কাজ চলবে না। হয় উঠে দাঁড়ান মাঝে মাঝে নয়তো হেঁটে আসুন।

অসভ্য কুকুর

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রনের প্রিয় কুকুরের নাম নেমো। কুকুরটি বেজায় অসভ্য।

সম্প্রতি মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে এসেছিল নেমো। তার চিৎকার-চেঁচামেচিতে বৈঠক প্রায় ভণ্ডুল হবার উপক্রম হয়। বিব্রত প্রেসিডেন্ট বলেন, 'নেমো এরকম করে না। আজ কেন করল কে জানে!

সমাবেশ -সমাচার

জম্মু দৃষ্টি কন্যা ছাত্রীনিবাসের ছাত্রীদের নাগপুর দর্শন

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালকের আহ্বানে জম্মুর দৃষ্টি কন্যা ছাত্রীনিবাসের ছাত্রীরা গত ৩০ সেপ্টেম্বর বিজয়াদশমীর দিন নাগপুর দর্শনে আসে। সেদিন সকালে তারা রেশিমবাগে ডাক্তারজী ও শ্রীগুরুজীর সমাধিভূমি দর্শন করে দেশের দশটি ভাষায় দশটি গান গায়। ১ অক্টোবর ছাত্রীরা মোহিতওয়ারের কেন্দ্রীয় সঙ্ঘকার্যালয়ে

সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবতের সঙ্গে দেখা করে। সরসঙ্ঘচালককে ছাত্রীরা সংস্কৃত ও তামিল ভাষায় দুটি গান গেয়ে শোনায়। পরে আরও ৫টি অন্য ভাষার গান গায়। এরপর ছাত্রীরা কার্যালয়ের মিউজিয়াম দর্শন করে। উল্লেখ্য, ছাত্রীদের নাগপুরে বিভিন্ন কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবকদের বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। সমস্ত বাড়িতে ছাত্রীদের আপন করে নেওয়া হয়।

নাগপুর থেকে ফেরার পর জম্মুতে সেবা ভারতীর কার্যালয় আর্যভট্ট সভাগারে তাদের অভিনন্দন ও অনুভব কথনের অনুষ্ঠান হয়। ছাত্রীদের এই নাগপুর ভ্রমণে সঙ্গী ছিলেন সেবা ভারতীর প্রবীণ কার্যকর্তা তথা প্রচারক জয়দেব সিংহ।

শঙ্খনাদ ও স্বস্তিকা পাঠকদের বিজয়া সম্মেলন

নদীয়া জেলার মদনপুর খণ্ডের জাগরণ পত্রিকার পক্ষ থেকে ৮ অক্টোবর শঙ্খনাদ ও স্বস্তিকা পত্রিকার পাঠকদের উপস্থিতিতে বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কালীকৃষ্ণ দাস। সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্বস্তিকা পত্রিকার প্রচার ও প্রসার প্রমুখ জয়রাম মণ্ডল। বিজয়া সম্মেলনের প্রধান বক্তা ছিলেন স্বস্তিকা পত্রিকার সম্পাদক ড. বিজয় আঢ্য।

সম্পাদক মহাশয় তাঁর বক্তব্যে স্বস্তিকা পত্রিকা কীভাবে জাতীয় ভাবধারা ৭০ বছর ধরে বিভিন্ন বাধাকে অতিক্রম করে প্রচার করে চলেছে তার বিশদ বর্ণনা করেন। তিনি মনে করিয়ে দেন, দেশ স্বাধীনতা প্রাপ্তির শুরুতেই জওহরলাল নেহেরু সরকার স্বস্তিকা পত্রিকার কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তিনি তা করতে পারেননি। অনুষ্ঠানে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কালীকৃষ্ণ দাস। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন রাধেশ্যাম মাঝি।

এই সময়

মুখর দীপাবলী

মুম্বইনিবাসী দীনেশ উপাধ্যায়ের কীর্তি ৮৯ বার গিনিস বুক অব রেকর্ডসে জায়গা করে

নিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ৫৭টি লিমকা রেকর্ড এবং ৩টি রিপলে বিশ্ব রেকর্ড। সম্প্রতি মুখ দিয়ে রেকর্ডসংখ্যক জ্বলন্ত মোমবাতি ধরে তিনি আরও একবার গিনিস বুকে জায়গা করে নিয়েছেন।

মহাকাশ থেকে

দীপাবলীর রাতে মহাকাশ থেকে ভারতকে কেমন দেখায়? এতদিন ফোটোশপ করা ভুয়ো

ছবিই ছিল এ প্রশ্নের উত্তর। এ বছর ইতালির মহাকাশচারী পাওলো নাসপলি মহাকাশ থেকে তুলেছেন ভারতের ছবি। সত্যি, অপূর্ব!

বালুকাবেলায়

সুদর্শন পট্টনায়ক মানেই বালি দিয়ে তৈরি অসামান্য সব মূর্তি। এমন কোনও

উৎসব-অনুষ্ঠান নেই যেখানে তিনি তার শিল্প নিয়ে হাজির থাকেন না। এবারে কালীপুজোয় তার আবেদন : পটকা-বোম ফাটাবেন না। আলো জ্বালান।

সমাবেশ -সমাচার

সংস্কার ভারতী সোনারপুর শাখার আগমনী অনুষ্ঠান

গত ২৫ সেপ্টেম্বর মহাপঞ্চমীর শুভ সন্ধ্যায় রাজপুর বাদামতলা দুর্গোৎসব কমিটির আহ্বানে পূজামণ্ডপে আগামনী অনুষ্ঠান পরিবেশন করে সংস্কার ভারতী সোনারপুর শাখার শিল্পীরা। চণ্ডীপাঠ-সহ সঙ্গীতালেখ্য 'দুর্গা দুর্গতিনাশিনী' ছিল প্রতিবারের মতো

এবারেরও প্রধান আকর্ষণ। রচনা ও পরিচালনা অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

পূজা মণ্ডপটির রূপসজ্জার পরিকল্পনা ও পরিচালনায় এবং রূপায়ণে ছিলেন সাত-আটজন পঞ্চাশোর্ধ্ব গৃহবধূ, তাঁরা সকলেই পূজাকমিটির সদস্যা।

মশাটে দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্রের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

গত ১ অক্টোবর তারকেশ্বর জেলার মশাট খণ্ডের বনপাঁচবেড়িয়া গ্রামে সমাজ সেবা ভারতী পরিচালিত 'ডাঃ বিশ্বনাথ সাহা স্মৃতি দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র'-এর প্রথম বর্ষ পূর্তি অনুষ্ঠান হয় । এই গ্রাম সম্পূর্ণ তফশিলি সম্প্রদায়ভুক্ত। অনুষ্ঠানে ১১০ জন গ্রামবাসী উপস্থিত ছিলেন। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন জেলা সেবাপ্রমুখ প্রবীর ধাড়া। উপস্থিত ছিলেন খণ্ড সেবা প্রমুখ তথা এই সেবাকেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ ভাস্কর হাজরা। অনুষ্ঠানের শেষে গ্রামেরই মা বোনেদের হাতে গড়া নারিকেল নাড়ু বিতরণ করা হয়।

খাস সমাচারের পূজা বার্ষিকী উদ্বোধন

গত ১৯ সেপ্টেম্বর মহালয়ার পুণ্যতিথিতে 'খাস সমাচারের' পুজো বার্ষিকীর উদ্বোধন হলো উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন কলেজের সভাগৃহে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সাংবাদিক মিহির গঙ্গোপাধ্যায়। অভ্যাগতদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজ্যের প্রথম মহিলা পুলিশ থানা ওসি মুনিরা বসু, উত্তরপাড়া পুরসভার সভাপতি দিলীপ যাদব, উত্তরপাড়া থানার প্রাক্তন ওসি তথা ডি এস পি প্রমুখ। এবারের পুজো সংখ্যা শতাধিক লেখক-লেখিকা, কবি তাঁদের লেখা ও লেখনীর মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন। উপস্থিত বক্তারা খাস সমাচার

এই সময়

সিঙ্গাপুরে দীপাবলী

এ বছর দীপাবলীতে মনোরম সাজে সেজে উঠেছিল সিঙ্গাপুর। পরিবহণ দপ্তরের অধীনস্থ

ল্যান্ড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির উদ্যোগে একটি ট্রেনকে দিয়া, হাতী এবং পদ্মের মুরাল দিয়ে সাজানো হয়। বেশ কিছু বাস এবং একটি স্টেশনকেও সাজানো হয়।

মণিপুরে খেলা

খুমন ল্যামপাক স্পোর্টস কমপ্লেক্সের আসনসংখ্যা বাড়ানোর ব্যাপারে রাজ্য সরকার

দায়বদ্ধ। আসনসংখ্যা শীঘ্রই ২৫,০০০ থেকে বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন. বীরেন সিংহ।

পাইকারিতে হ্রাস

খাদ্যদ্রব্যের পাইকারি বাজারদর নিয়ন্ত্রিত হবার সঙ্গে সঙ্গে, গত সেপ্টেম্বরে পাইকারি মূল্য

সূচক হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২.৬০ শতাংশে। আগস্টে এই সূচক ছিল ৩.২৪ শতাংশ। প্রতিটি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের পাইকারি মূল্য সূচক ০.৪ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

সমাবেশ -সমাচার

পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক গোঁসাই চন্দ্র দাসের একক প্রচেষ্টায় এমন উৎকৃষ্ট পুজো সংখ্যা পাঠক-পাঠিকাদের হাতে পৌঁছে দিয়েছেন বলে তার ভূয়শী প্রশংসা করেন। হুগলী জেলা তথা উত্তরপাড়া-হিন্দুমোটর-কোন্নগর অঞ্চলের ছোট সংবাদ পাক্ষিক যেভাবে সম্পাদক মহাশয়ের অক্লান্ত শ্রমের ফলে সাফল্য পেয়েছে তা সবারই নজর কেড়েছে। উপস্থিত সকলেই 'খাস সমাচার'-এর উত্তরোত্তর সাফল্য ও উৎকর্ষ কামনা করেন।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তাম্রলিপ্ত জেলা শাখার উদ্যোগে প্রাথমিক সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তাম্রলিপ্ত জেলা শাখার উদ্যোগে ৭ অক্টোবর শনিবার থেকে ১৫ অক্টোবর রবিবার পর্যন্ত গোপালপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রাথমিক সঙ্ঘ শিক্ষণবর্গ অনুষ্ঠিত হলো। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৭৯ জন শিক্ষার্থী ও ১১ জন শিক্ষক এই শিক্ষণবর্গে অংশগ্রহণ করেন। এই শিক্ষণবর্গে উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র,

কৃষক, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী প্রভৃতি সমাজের সর্বস্তরের দেশপ্রেমিক নাগরিকদের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়। শিক্ষণবর্গের সমারোপ অনুষ্ঠানে বিভাগ প্রচারক দেবাশিস অধিকারী, বিভাগ সহ-কার্যবাহ গৌরহরি সামন্ত, জেলা প্রচার প্রমুখ বৈদ্যনাথ মণ্ডল, গ্রাম সেবা প্রমুখ কমলেশ জানা উপস্থিত ছিলেন। সমারোপ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা দলবদ্ধভাবে সূর্য নমস্কার, ব্যায়াম, মুষ্টিযুদ্ধ ও লাঠিখেলার বিভিন্ন কলাকৌশল প্রদর্শন করে।

বিভাগ প্রচারক দেবাশিস অধিকারী দেশ গঠনে স্বামী বিবেকানন্দ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের মহান ভূমিকার উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রত্যেক স্বয়ংসেবক যে দেশ গঠনে নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে তার উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কোনো সাম্প্রদায়িক সংগঠন নয়, এটি একটি দেশপ্রেমিক সংগঠন এবং এই সংগঠনে যে কোনো উচ্চ নীচ ভেদাভেদ নেই তার উল্লেখ করেন। ভারতের শিক্ষা, বিজ্ঞান, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই সমৃদ্ধ এবং হিন্দুত্ব যে কোনো পৃথক ধর্ম নয় এটি ভারতের জাতীয়তা তার উল্লেখ করেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রতিটি শাখায় যে দেশগঠনের জন্য স্বয়ংসেবক তৈরি হয় একথা তিনি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করেন ও হিন্দুদের বিভিন্ন অপশক্তির হাত থেকে রক্ষার জন্য ঐক্য ও সঙ্ঘশক্তির উপর জোর দিতে বলেন।

মানুষ যখন অত্যাচারিত তখন ভিজিল্যান্টিদের আবির্ভাব ঘটে

প্রবাল চক্রবর্তী

সাদা জামায় নীল দিলে সুন্দর দেখায়। নীলে রাঙানো জামা ইউরোপের ধনী মহলে এককালে ছিল আভিজাত্যের লক্ষণ। আর তার মূল্য চোকাতে বাংলার কৃষকরা হতো পথের ভিখারি। তারই প্রেক্ষাপটে হয়েছিল নীল বিদ্রোহ। সে ছিল বাংলার ইতিহাসের এক নির্ণায়ক মুহূর্ত।

নীলচাষ শুরু হওয়ার আগে চাষবাস ছিল বাঙালি চাষির পারিবারিক ব্যাপার। চাষি যা চাষ করত, তাই দিয়ে পরিবারের ক্ষুণ্নিবৃত্তি হতো। ফসল বেচে ব্যবসা করাটা ছিল গৌণ উদ্দেশ্য। চাষ ছিল চাষির কাছে আত্মার সাধনা, তা ছিল স্বার্থলেশরহিত। মাটির সঙ্গে চাষির

সম্পর্ক ছিল মা ও সন্তানের সম্পর্ক। নীলচাষ মাটির সঙ্গে চাষির সেই পবিত্র বন্ধনকে দিল বদলে। চাষির স্বনির্ভরতা, তার আত্মসম্মানকে ধ্বংস করে তাকে বিদেশি শাসকের দাসে পরিণত করার চেষ্টা করেছিল নীলের ব্যবসা। নীলচাষকে ঘিরে বাংলার চাষি দেখেছিল পুঁজিবাদী লোভের নগ্ন রূপ। দেখেছিল হিন্দুবিদ্বেষের নোংরা গা-ঘিনঘিনে এক জগৎ। বর্ণবিদ্বেষী সাহেবরা জোর করে নামমাত্র দামে চাষিদের দিয়ে নীলের 'দাদন' বা চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়ে নিতো। চুক্তি অনুসারে চাষ করতে গিয়ে চাষিকে পরিবারসুদ্ধ পথে বসতে হতো। দখল হয়ে যেত তার পূর্বপুরুষের জমিজমা ভিটেমাটি।

নীলের দাদনের মধ্য দিয়ে বাংলা তথা ভারতের বিরুদ্ধে এক বিরাট ষড়যন্ত্র সংগঠিত হয়েছিল সেদিন। পাশ্চাত্যের সম্প্রসারণবাদী শক্তিগুলো দেখেছিল, ভারতের কৃষকদের আত্মিক টান রয়েছে মাটির সঙ্গে। বুঝেছিল, এই টান যতদিন রয়েছে, ততদিন তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিপন্মুক্ত নয়। মাটির প্রতি দেশের মানুষের ভালোবাসাই সাম্রাজ্যবাদের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে একদিন। নীলের দাদনের মাধ্যমে সেদিন চেষ্টা হয়েছিল যাতে বাংলার চাষিদের বাস্তুচ্যুত করা যায়। তাদের ভূমি থেকে বিযুক্ত করে, বিমুখ করে ক্রমে শিকড়হীন করে তোলার চেষ্টা হয়েছিল সেদিন। বাংলায় সফল হলে সেই সূত্রটি গোটা ভারতে প্রয়োগ করা হতো পরবর্তীকালে। এইভাবে ভারতীয় জাতির চরিত্রটাই বদলে দেওয়া যেতো। প্রকৃতির সঙ্গে হিন্দুর মাতা-পুত্রের সম্পর্ক শেষ করে দিতে পারলে হিন্দুজাতিকে আত্মবিস্মৃত এক কিম্ভুত জাতিতে পরিণত করা যেত। নিষ্কণ্টক হতো সাম্রাজ্যবাদ।

নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ সেদিন বাংলায় ঘটেছিল, সম্পূর্ণ অসংগঠিত হওয়া সত্ত্বেও তা পাশ্চাত্যমুগ্ধ সুধী সমাজের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। নীলচাষিদের সে আন্দোলন অহিংস ছিল না সহিংস, এ প্রশ্ন অবান্তর। ক্ষুধার্ত মানুষ যখন আত্মরক্ষার জন্য লড়ে, তখন সে পন্থা নিয়ে ভাবে না। তাকে পন্থা নিয়ে উপদেশ দেওয়া অমানবিকতার শামিল। নীলবিদ্রোহের ফলে, দীনবন্ধু মিত্রর নীলদর্পণের মাধ্যমে সভ্য জগৎ জানতে পেরেছিল নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা। কিন্তু তাতেও নীলকর সাহেবদের অত্যাচার পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। সেটা বন্ধ হলো এক আশ্চর্য ঘটনার মাধ্যমে। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে। ইউরোপে এক বিজ্ঞানী কৃত্রিম উপায়ে নীল তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন। দেখা গেল, প্রাকৃতিক নীলের তুলনায় কৃত্রিম নীল গুণমানে উৎকৃষ্ট, অথচ কৃত্রিম নীলের উৎপাদন খরচ প্রাকৃতিক নীলের তুলনায় ভগ্নাংশ মাত্র। ব্যাস, নীলের চাষ উঠে গেল পৃথিবী থেকে। বাংলার চাষির জীবন থেকে এক অভিশাপ অন্তর্হিত হলো।

সেদিনের সেই নীলবিদ্রোহের সঙ্গে আজকের গোরক্ষা আন্দোলনের বেশ কিছু মিল রয়েছে। ইতিহাসের আঙ্গিকে বর্তমানকে দেখলে অনেক ক্ষেত্রেই বহু অজানা তথ্য উঠে আসে। ইতিহাস বর্তমানের কষ্টিপাথর, সে পথ দেখায় ভবিষ্যৎকে। আজ সেরকমই একটা চেষ্টা করা যাক।

ছোটবেলায় গ্রামবাংলায় অনেক ঘুরেছি। দেখেছি, গ্রামের কৃষক পরিবারগুলো যেন একেকটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট। ছোট্ট কুঁড়েঘর, তার সামনে ধানক্ষেত। ফাঁকে ফাঁকে ডালের চাষ, তরিতরকারির বাগান। খিড়কির পুকুর ভর্তি মাছ। বাড়ির সংলগ্ন গোয়াল, তাতে দুটি গাভী, দুটি বলদ। গোয়ালের গোরু সেই পরিবারের সদস্য। সে গোরুর চোখ টানটান কাজলকালো। কী সুন্দর। কী মায়াভরা তাদের দৃষ্টি। পরিবারে কোনো অঘটন ঘটলে প্রথম টের পায় পরিবারের গোরুটাই। পরিবারের আনন্দে খুশি হয়, পরিবারের দুঃখে নীরবে অশ্রুবিসর্জন করে সে। 'গোহত্যা' ব্যাপারটা ভারতের কৃষকসমাজের কাছে একটা বিজাতীয় ব্যাপার। পরিবারের সদস্যকে কেউ হাটবাজারে বেচে

না, তাকে নিয়ে কেউ ব্যবসা করে না। অর্থের বিনিময়ে পরিবারের সদস্য গোরুটাকে বেচে দেওয়ার সম্ভাবনাটাই গ্রামীণ ভারতীয় সমাজের মানসিকতায় এক অশুভ পরিবর্তন এনেছে। প্রতিটা সম্পর্কই হয়ে দাঁড়াচ্ছে অর্থের সম্পর্ক। লাভ আছে, তাই তুমি আছো। লাভ না থাকলে পরিবারের সদস্যকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দিতে বেশি সময় লাগে না আর আজ।

অথচ, কী করবে ভারতবর্ষের গ্রামের মানুষ। গোরুচোররা ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। পেট্রোডলারে বলীয়ান, পেছনে তাদের রয়েছে কিছু রাজনৈতিক দলের প্রচ্ছন্ন সমর্থন, ধর্মান্ধতার জোশ। তার ওপর, গোরুপাচার এক অতীব লাভজনক ব্যবসা। এইসব গোব্যবসায়ীরা নামমাত্র মূল্যে কিনে নেয় ঘরের গোরুটিকে। না বেচলে রাতের আঁধারে চুরি করে নিয়ে যায়। বাধা দিতে গেলে খুন হয়ে যায় গৃহস্থ। বাধ্য হয়েই মানসিকতার পরিবর্তন করেছে গ্রামের মানুষ। সেদিনের নীলচাষের মতোই এযুগে গোরুর ব্যবসার আড়ালে চেষ্টা চলছে ভারতের মানসিকতা পরিবর্তনের। প্রকৃতির সঙ্গে মা-সন্তানের সম্পর্কটাকে আলগা করতে হবে। আজ যে গোরুর দুধ খেলে, শিশুর সারল্য নিয়ে যাকে মা বলে ডাকলে, আগামীকাল তাকে হাটে গিয়ে বেচে আসতে হবে। গোরুচুরি আজ এক সংগঠিত অপরাধ। তার বিরুদ্ধে লড়াইটা কিন্তু আজও অসংগঠিত। আজকাল সংবাদমাধ্যমে 'কাউ ভিজিল্যান্টি' বা গোরক্ষক কথাটা খুব শোনা যায়। এরা নাকি ভারত জুড়ে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। গোরু ব্যবসায়ীদের ধরে ধরে পেটাচ্ছে। খুব অন্যায় করছে। মুশকিল কী জানেন, 'ভিজিল্যান্টি' কথাটা ব্যবহারের মাধ্যমেই কিন্তু এরা আসল গল্পটা বলে দিয়েছে। অন্যায় যখন সর্বশক্তিমান, রাজশক্তি যখন সেই অত্যাচার থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষার কোনো চেষ্টাই করে না, তখন সমাজে ভিজিল্যান্টিদের আবির্ভাব ঘটে। যেমন ইংল্যান্ডের রবিনহুড, যেমন আমাদের রঘুডাকাত। ভিজিল্যান্টি এদেরই বলে। যদি কাউ ভিজিল্যান্টিদের নিরস্ত করতে হয়, তাহলে সর্বাগ্রে গোরুচুরি ও গোরুপাচার পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে। গ্রামীণ গৃহস্থদের পাশে দাঁড়াতে হবে। গোরুপাচারের সংগঠিত মাফিয়াদের ধ্বংস করে দিতে হবে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যতদিন সেটা না হচ্ছে, কাউ ভিজিল্যান্টিদের গালি দিয়ে লাভ নেই।

গোহত্যা নিয়ে আরেকটা কথা আজকাল বাজারি সংবাদমাধ্যমে প্রায়শই শোনা যায়—''খাদ্যাভ্যাসের স্বাধীনতা''। কে কী খাবে, সেটা অন্য কেউ বলে দেবে কেন? সেটা তো সভ্য মানুষের দস্তুর নয়। নিউজিল্যান্ডের মাউরি উপজাতির লোকেরা এককালে নরমাংসভোজী ছিল। সেদিন এই সভ্য মানুষরাই জোর করে মাউরিদের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করেছিল। কারণ, মানুষ খাওয়া অনৈতিক। মানুষের মতো একটা আবেগে ভরপুর জীবকে মারলে কাটলে তার পরিণতি ভালো হয় না। স্মৃতি শুধু মস্তিস্কেই থাকে, তা তো নয়। শরীরের প্রতিটি কোষই স্মৃতির ভাণ্ডার। আধুনিক বিজ্ঞানীরাও আজ মানেন 'সেল মেমোরি' ব্যাপারটা। আমরা আজ যা খাই, পরিপাকের মাধ্যমে কয়েকদিনের মধ্যেই সেটা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের শরীরের অঙ্গ। ভুক্ত জীবটির যাবতীয় আবেগ, অনুভূতি—সবকিছুই সূক্ষ্ম রূপে আমাদের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। এবার ভেবে দেখুন, গোরুর মতো একটা জীব, যারমধ্যে এত আবেগ, এত ভালোবাসা রয়েছে, তাকে খাওয়াটা কতটা ঠিক? যে নিরপরাধ পরোপকারী গোরুটাকে কোরবানি করে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা হলো, তার মাংস খাওয়ার মাধ্যমে সেই গোরুটার যন্ত্রণা, কষ্ট, তার যাবতীয় ''ট্রমা'' আমাদের শরীরেই তো এসে জুটবে! সেইসব অনুভূতি মানুষ থেকে ধীরে ধীরে অমানুষের স্তরে টেনে নামাবে আমাদের।

পৃথিবীতে খুব কম দেশই আছে, যেখানে লোকে বাঁদর বা বনমানুষ (গরিলা, শিম্পাঞ্জী, ওরাংওটাং) মেরে খায়। ধরাধামের বিস্তীর্ণ সমুদ্রে ডলফিন ও তিমি শিকার অবৈধ। কারণটা স্বাভাবিক। বাঁদর, বনমানুষ, ডলফিন, তিমি এরা মানুষের মতোই আবেগে ভরপুর প্রাণী। এরা আত্মসচেতন। পাশ্চাত্যের কোনো দেশেই কুকুর খাওয়া চলে না। সেখানে কুকুর গৃহপালিত পশু, তাই পাশ্চাত্যের মানুষ জানে একটা কুকুরের মধ্যে কত আবেগ, কতটা ভালোবাসা রয়েছে। এই কথা আমরা হিন্দুরাও জানি। তাই আমরা গোরু খাই না। তাই আমরা গোহত্যার বিরোধী। যে-কোনো বুদ্ধিমান জীবকে হত্যা ও ভক্ষণ নরমাংস ভোজনের মতোই বিবমিষা উদ্রেককারী। গোহত্যার মতো নৃশংস কাজ পৃথিবীতে খুব কমই রয়েছে। কিন্তু গোহত্যা পুরোপুরি বন্ধ করা কি সম্ভব? পৃথিবী সুদ্ধ সবাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে তাদের খাদ্যাভ্যাস বদলে ফেলা প্রায় অসম্ভব। আর যতদিন কিছু লোক গোমাংস খাবে, ততদিন লুকিয়ে চুরিয়ে হলেও গোহত্যা চলবে। আর এখানেই বিজ্ঞান এক নতুন সম্ভাবনা বয়ে নিয়ে এসেছে।

জীবিত প্রাণীর মেরুদণ্ড থেকে একবিন্দু মজ্জা সংগ্রহ করে তাকে ল্যাবরেটরিতে কোষ বিভাজনের মাধ্যমে মাংসপেশীতে রূপান্তরিত করতে পেরেছেন বিজ্ঞানীরা। গোটা জীবিত প্রাণী নয়, শুধুমাত্র প্রাণীটির একটি মাংসপেশী। একে বলে ক্লোনিং। এই ক্লোনিং পদ্ধতিতে কোনো প্রাণীহত্যা না করেও দেদার মাংস তৈরি করা সম্ভব। যে কোনো প্রাণীর মাংস! ল্যাবরেটরিতে তৈরি সেই মাংসের দাম হবে কসাইখানার মাংসের দামের ভগ্নাংশ মাত্র। পৃথিবীর বড় বড় ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্টরা আজকাল দেদার টাকা ঢালছেন কৃত্রিম মাংস তৈরির প্রক্রিয়াকে নিখুঁত করতে। অনুমান করা যাচ্ছে, আগামী পাঁচ-সাত বছরের মধ্যেই এই কৃত্রিম মাংস বাজারে এসে পড়বে। তার সঙ্গেই পৃথিবী জুড়ে যাবতীয় কসাইখানায় পড়বে তালা। গুণমানে উৎকৃষ্ট সস্তার কৃত্রিম মাংস ছেড়ে কেই বা আর বেশি দাম দিয়ে কসাইয়ের কাছ থেকে গুণমানে নিকৃষ্ট মাংস কিনতে যাবে।

কৃত্রিম নীলের উদ্ভাবন বাংলার গ্রামীণ জীবনে যে আশীর্বাদ এনেছিল, কৃত্রিম মাংস সেইরকমই আশীর্বাদরূপে আসবে ভারতের জনজীবনে। সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন মাংসের জন্য গোরুচুরি আর লাভজনক থাকবে না। সেদিন শুধু ভারতবর্ষেই নয়, বিশ্বজুড়েই বন্ধ হবে গোহত্যা। মাংসের জন্য আর কোনো পশুকেই হত্যা করতে হবে না মানবজাতিকে। রক্ষা পাবে প্রকৃতি।

■

নিবেদিতার যুগ : ঐতিহাসিক ভাষ্য না অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ

এবছর লোকমাতা নিবেদিতার জন্ম সার্ধশতবর্ষ। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা সম্পর্কে বাঙালি মননে স্বাভাবিক ভাবেই প্রগাঢ় অনুভূতি জমে রয়েছে। স্বামীজীর চিন্তাভাবনা ও কর্মযজ্ঞের সার্থক প্রতিফলন রয়েছে নিবেদিতার কর্মপ্রবাহে। তিনি সঠিক অর্থে ভারত-চেতনার সার্থক প্রতিমূর্তি আবার অন্যদিকে তিনি হয়ে উঠলেন লোকমাতা। তাঁর সমকালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষীগণ তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তোলেন। এদের মধ্যে ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ, সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ, দেশপ্রেমিক বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপত রায়, ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার ও সর্বোপরি বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র। ভারতের বৌদ্ধিক, আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সঠিকভাবে, গভীর ভাবে আত্মস্থ করেছিলেন নিবেদিতা।

কিন্তু মনে সংশয় জাগে যে সক্রিয় রাজনীতি তথা বিপ্লববাদের স্রোতের সঙ্গে নিবেদিতা কতটা যুক্ত ছিলেন? এবারের পূজাসংখ্যা স্বস্তিকায় বিশালাকায় সুখপাঠ্য নিবন্ধে শ্রী রন্তিদেব সেনগুপ্ত ১৯০২ থেকে ১৯১১ সালের সময়কালকে 'নিবেদিতার যুগ' বলে চিহ্নিত করেছেন। কোনো প্রাইমারি তথ্যসূত্রে একথার সমর্থন মেলে না। ব্যক্তির ভূমিকা লিখতে গিয়ে ব্যক্তিভজনা ইতিহাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করা যায় না। বাংলার বিপ্লববাদে নিবেদিতার সঠিক ভূমিকা নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। ওই সময়ে গোয়েন্দা রিপোর্টে নিবেদিতা সম্পর্কে নীরবতা লক্ষ্য করা যায়। প্রামাণ্য সূত্রের ভিত্তিতে রচিত অমলেশ ত্রিপাঠীর The Extremist challenge অথবা সুমিত সরকারের The Swadeshi movement in Bengal গ্রন্থে নিবেদিতাকে বিপ্লববাদের মূল হোতা বলা হয়নি। কেননা নিবেদিতা প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর ভূমিকা পালন করেছেন। আসলে বিশ শতকের প্রথম দশকে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাংলায় যে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে উঠে ছিল, তাতে সমগ্র বাংলার সার্বিক ভূমিকা ছিল। তাই বিশিষ্ট চিন্তাবিদ বিনয় সরকার এই সময়কে 'বঙ্গ বিপ্লবের যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। গণজাগরণে বিপিনচন্দ্র পাল ছিলেন পুরোধা আর শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন ঝড়ঝাপটার ঋত্বিক। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গঠনমূলক স্বদেশী ভাবনার মূল উদ্‌গাতা। তাই বিভিন্ন শাখা প্রশাখার সম্মিলন ছিল স্বদেশী আন্দোলন। শেষের দিকে বোমার রাজনীতি প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু তার পরিসর ছিল সীমিত, অন্যদিকে পঞ্জাবে লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে কৃষক সম্প্রদায় বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। বাংলার আন্দোলন মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

এছাড়া, বিপ্লববাদী আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলনের একমাত্র পথ ও পন্থা ছিল না। বিদেশী চেতনা বাঙালি মনন ও সংস্কৃতির সবদিককে প্রভাবিত করেছিল। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' অথবা 'বাংলাদেশের হৃদয় হতে' কিংবা 'জীবন যেন যায় চলে বন্দে মাতরম্ বলে' বাঙালি মানসকে মাতিয়ে তুলেছিল। আর মুকুন্দ দাস? তাঁর যাত্রাগান গ্রামে গঞ্জে মানুষের মনে ঝড়ের মাতন সৃষ্টি করেছিল। তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক আখ্যানে এই বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে না।

শেষ কথা, গিরিজা শঙ্কর রায়চৌধুরী নিবেদিতাকে বাংলার বিপ্লববাদের কেন্দ্রীয় চরিত্র হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। বস্তুতপক্ষে নিবেদিতার বিপ্লববাদ নিয়ে একটা অতিকথা (মিথ) সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। গিরিজা শঙ্করের একপেশে ভাষ্যকে অনেকেই অতিরঞ্জিত বলে নাকচ করেছেন। তবে যে মানুষটি অনেক আগেই বিকল্প সংগ্রামী রণনীতির কথা পেশ করেছিলেন তিনি হলেন শ্রীঅরবিন্দ। ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত New Lamps for the old-এ তিনি 'রাজনৈতিক বেদান্ত'র চিন্তন তুলে ধরেছিলেন। স্বামীজীর 'ফলিত বেদান্ত'র চিন্তন তুলে ধরেছিলেন। স্বামীজীর 'ফলিত বেদান্ত'র পরিপূরক ছিল এই ভাবধারা। স্বদেশী আন্দোলনে এই তত্ত্বের প্রয়োগ দেখা যায়।

—**প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়,**
সল্টলেক কলকাতা-৭০০০৬৪।

চিঠিপত্র

একাদশীর পৌরাণিক ব্যাখ্যা

স্বস্তিকা ৩১ জুলাই, ২০১৭ 'আমাদের ধর্ম আমাদের কর্ম সংযমের অন্য নাম একাদশী' নন্দলাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের লেখা প্রসঙ্গে এই প্রত্রের অবতারণা।

পদ্মপুরাণ অনুসারে একাদশী ব্রত মাহাত্ম্যের বক্তা ব্যাসদেব, শ্রোতা জৈমিনি। বিশ্ব সৃষ্টির প্রারম্ভে স্বয়ং ভগবান প্রপঞ্চাত্মক সংসারে স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি করে মানব শাসনের জন্য একটি পাপপুরুষ সৃষ্টি করেছিলেন। সেই পাপ মূর্তির অঙ্গসকল পাপ দ্বারাই বিশালদেহী ভয়ঙ্কর পুরুষ নির্মিত হলো। নিজ সৃষ্ট পাপ পুরুষের এই প্রকার ভয়ঙ্কর মূর্তি দর্শন করে ভগবান চিন্তায় পড়লেন। তখন ভগবান বিষ্ণু গরুড়ের আরোহণ করে যম ভবনে গেলেন। যম তাঁকে উপযুক্ত স্বর্ণ সিংহাসনে বসিয়ে পাদ্যাদি দ্বারা আপ্যায়ন পূজাদি করলেন। যম সদনে অবস্থান কালে পাতকী মর্ত্য জীবগণের দুঃখজনক নরক যন্ত্রণাভোগের কথা কানে শুনে তিনি স্বশরীরে সেখানে উপস্থিত হলেন। মর্ত্যের পাপিষ্ঠ মানুষকে যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় দেখে তাঁর হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হলো। তাঁর মনে হলো আমি নিজে এই প্রজা সৃষ্টি করেছি— আমি সর্বশক্তিমান, আর আমি থাকতে এরা নিজ কর্মদোষে এই দুঃসহ নরকযন্ত্রণা ভোগ করছে। এই মনে করে তিনি নিজে একাদশী তিথিরূপে মূর্তি ধারণ করলেন। তারপর তিনি সেই পাপীগণকে একাদশী ব্রত আচরণ করালেন। তারা তৎক্ষণাৎ পাপমুক্ত হয়ে পরমধাম বৈকুণ্ঠে

চলে গেল। তাই ব্যাসদেব তাঁর শিষ্য জৈমিনিকে বললেন একাদশী তিথি পরমাত্মা বিষ্ণুর মূর্তি বলে জানবে। সকল সুকর্মের শ্রেষ্ঠ ব্রত সকলের উত্তম এই একাদশী তিথি ত্রিভুবন পবিত্রকারী।

এর কিছুক্ষণ পরে ভগবৎসৃষ্ট সেই পাপপুরুষ বিষ্ণুর নিকটে এসে বললেন,— 'আমি আপনার প্রজা। মানুষের কর্মানুসারে তাদেরকে দুঃখ দানই আমার কাজ ছিল। কিন্তু এখন একাদশী প্রভাবে আমি কর্মহীন'। কারণ একাদশী ব্রতের প্রভাবে সকলেই বৈকুণ্ঠবাসী হতে চলেছে। এখন আমি কী করবো? আর সকল জীব বৈকুণ্ঠে চলে গেলে আপনার মর্ত্যলীলা কীভাবে সম্ভব হবে? যদি আপনার বিশ্ব সৃষ্টি রূপ-লীলা কৌতুক করার আকাঙ্ক্ষা থাকে তাহলে একাদশী তিথির ভয় থেকে আমাকে রক্ষা করুন'।

তখন ভগবান হাস্য সহকারে সেই পাপপুরুষকে বললেন তুমি দুঃখ করো না। ত্রিভুবন পবিত্রকারিণী একাদশী তিথি আবির্ভূত হলেও তুমি অন্ন ও রবিশস্য প্রভৃতিতে আশ্রয় করে অবস্থান করবে। আমার মূর্তি তোমায় বধ করবে না। এজন্য একাদশীতে অন্ন ও রবিশস্য আহার বর্জনীয়।

হরিবাসর (একাদশী) সমাগত হলে ভোজন করা উচিত নয়— পুরাণ সমূহে বারবার বিঘোষিত হয়েছে। হরিবাসর সমাগত নিখিল পাপরাশি অন্নমধ্যে অধিষ্ঠিত হয়। সেই হেতু হরিবাসরে ভোজন করলে যাবতীয় পাপই গ্রহণ করা হয়।

নন্দলাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে জানতে ইচ্ছা হয় আপনি বলেছেন— 'হবিষ্যান্ন চলতে পারে। বিকেলে হবিষ্যান্নের পরিবর্তে একবেলা রুটি-লুচি— পরোটাও'। তার পরের অনুচ্ছেদে বলেছেন একাদশীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে হরি বা বিষ্ণুর আরাধনার বিষয়টি।' একাদশী পালন করলে...লাভ হয় পরামার্থ— বিষ্ণু বা হরির কৃপা। তাহলে আপনার লিখিত প্রবন্ধ বিষ্ণু বা হরির মতাদর্শে নয়। তাঁর নির্দেশিতও নয়। এ লেখায় সমাজ সংসারে বিভ্রান্তি বাড়বে। আমরা সংসারে সমাজে দেখি অনেককেই আটা খেয়ে একাদশী পালন করতে। ব্যঙ্গ করে তাকে আটাদশী বলা হয়। আপনার লেখা তাতে নতুন রসদ জোগাবে, লজ্জিত হবে পরমপুরুষের নির্দেশ। পরিবর্তে পাপপুরুষের কবলে পড়ে হবে জীবের বিনাশ।

আপনি আপনার লেখায় একাদশী প্রসঙ্গে অন্যদের কথা বললেও বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবদের কথা কোথাও উল্লেখ করেননি। চাতুর্মাস্য প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এখন এই ব্রত মূলত সন্ন্যাসীরাই পালন করেন'। এটিও ঠিক নয়। চাতুর্মাস্য ব্রত বৈষ্ণবদের একটি অন্যতম ব্রত এবং তা সর্বজনবিদিত। এই কথার দ্বারা বিষ্ণুর পরম ভক্ত বৈষ্ণবদের অন্তকরণে আঘাত দেওয়া হলো না কি?

—শান্তি কুমার পান,
রাওতরী, সালার, মুর্শিদাবাদ।

সোমনাথ মন্দির

আইনজীবী ধর্মানন্দ দেব তাঁর নিবন্ধে (স্বস্তিকা, ২৮.৮.১৭) বলেছেন, শীঘ্রই রামমন্দির করতে হলে আদালত নির্ভর না হয়ে সংসদে প্রয়োজনীয় আইন পাশ করতে হবে। ঠিক যেভাবে সোমনাথ মন্দির নির্মাণের বিলটি সংসদে পাশ হয়েছিল। কথাটি কি ঠিক? সোমনাথ মন্দির পুনর্গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা, তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কে. এম. মুন্সীর Somanotha, The Shrine Eternal গ্রন্থে সোমনাথ মন্দির পুনর্গঠনের ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। সেই গ্রন্থে তেমন কোনো বিল পাশের উল্লেখ নেই। গান্ধীজী সর্দার প্যাটেলকে বলেছিলেন, মন্দিরটির পুনর্গঠনের কাজে সরকারি কোষাগারের অর্থ ব্যয় করা সমীচীন হবে না। সদার প্যাটেল গান্ধীজীর অভিমত মেনে নিয়েছিলেন, (''When the whole scheme was discussed by Patel with Bapu, he stated that it was all right except that the funds necessary for reconstructing the temple should come from the public. N.V. Gadgil also saw Bapu and Bapu gave him the same advice. Thereafter, the idea of that the Govt. of India should finence the reconstruction of the temple was given up"–11-180-81).

অতঃপর, 'সোমনাথ ট্রাস্ট' গঠিত হয়। নবনগরের সাম সাহেব ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হন। ওই বোর্ডের তত্ত্বাবধানে জনগণের কাছ থেকে সংগৃহীত ২৪,৯২,০০০ টাকায় সোমনাথ মন্দির পুনর্গঠিত হয়েছিল। তাই, ওই কাজে সংসদে বিল পাশের প্রয়োজন হয়নি।

—বিমলেন্দু ঘোষ,
কলকাতা-৬০।

স্বস্তিকা প্রসঙ্গে

স্বস্তিকা পড়া আমার নেশার মতন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা হলেই শ্যামবাজারের 'বুকস্টল'— পরিতোষবাবুর কাছে ছোটা, কেনা ও বাড়ি গিয়ে আদ্যোপান্ত পড়া। প্রতি সংখ্যাই বিশেষ সংখ্যা। লেখার ভাষা বলিষ্ঠ, প্রাঞ্জলতায় ভরপুর, দুঃসাহসিকতার তারিফ করতে হয়। প্রকাশ নিয়মে পূজা সংখ্যা অতুলনীয়, অভিবাদন আন্তরিক--- দীপাবলী'র সংখ্যা বেরোলে কিনবো এবং পড়বো।

—অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়,
১, পার্কস্ট্রিট, কলকাতা-১৬।

With Best Compliments from -

A Well Wisher

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

কাণ্ডারিয় মহাদেব
হিন্দু অস্মিতার এক প্রতীক

সৌমেন নিয়োগী

নবম থেকে ত্রয়োদশ খ্রিস্টাব্দ অবধি অধুনা মধ্যপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ড অঞ্চল সেকালের জেজাকাভুক্তি ছিল চান্দেলা রাজপুতদের রাজত্ব এবং খাজুরাহো ছিল তাদের রাজধানী। বিভিন্ন উৎকীর্ণলিপি থেকে প্রাপ্ত তত্ত্ব অনুসারে চান্দেলা বংশীয় রাজপুতদের উদ্ভব হেতু বিনম্রভাবে কাল্পনিকতার সূত্রে চন্দ্রদেবকে প্রদান করা হয়েছে। ৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে খাজুরাহোর উৎকীর্ণ লিপি থেকে প্রাপ্ত সেই কাল্পনিক উৎপত্তির কথাই উঠে এসেছে। দুদাহি শিলালিপি 'চান্দেলা' নামকরণের সাক্ষ্য যে দেবালব্ধীর তালিকাভুক্ত তা প্রমাণ করে। ১৭ শতকে মাহোবাখণ্ডে পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে ব্রাহ্মণ বিধবা হেমাবতী ও চন্দ্রদেবের ঔরসজাত চন্দ্রবর্মণ থেকেই 'চান্দেলা' রাজপুত্রদের উদ্ভব, যা সে যুগে কোনো রাজবংশের সামাজিক গৌরবকে উৎকর্ষে নিয়ে যাবার এক নম্র প্রয়াস।

চন্দ্রবর্মণের হাত ধরে খাজুরাহোকে রাজধানী করে চান্দেলা রাজপুতদের উত্থানের গৌরব গাথার সাক্ষ্য প্রমাণ বহন করে চলছে তাদের শিল্পকলা। যার নিদর্শন মধ্য-নাগর স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত ৮৫টির মধ্যে টিকে থাকা ২০টি বেলে পাথরের মন্দির। দশম শতক থেকে শুরু করে একাদশ শতক পর্যন্ত চান্দেলা রাজ যশোবর্মন (৯২৫-৯৫০), ডঙ্গা (৯৫০-১০০২), গণ্ডা ও বিদ্যাধর প্রভৃতি চান্দেলা নৃপতিদের শৌর্যবীর্যের পরাক্রমে খাজুরাহোতে গড়ে ওঠে স্থাপত্য শিল্পকলার এক অমোঘ সৃষ্টি যা সহস্র বছর ধরে মুসলমান সাম্রাজ্যবাদীদের তীব্র আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ও কালের করাল গ্রাস থেকে ৬০০ বছরের অধিক সময় বিস্মৃতির অচলায়তন

থেকে ব্রিটিশ সার্ভে দলের হাত ধরে ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় লোকসমক্ষে আসে। অরূপের রূপ প্রদান হেতু চান্দেল রাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত খাজুরাহোর মন্দিরগুলি যা বর্তমানে পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ জুড়ে বিরাজ করছে, শিল্প সৌন্দর্যের গরিমায় হয়ে উঠেছে রূপতীর্থ। ফলে সঙ্গত কারণেই ১৯৮৬ সালে UNESCO World Herritage হিসেবে স্বীকৃতি। উত্তর ভারতের বিভিন্ন নির্মাণ স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে খাজুরাহোর মন্দিরগুলি সমজাতীয়। তথাপি, যমুনা কেন নর্মদা ও বেতওয়া নদীর বেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত মালওয়া চেদি দশহরণা অঞ্চলকেই প্রধানত খাজুরাহো শিল্পকলার উৎপত্তি স্থান হিসেবে বলা যেতে পারে। মধ্য-নাগরশৈলীতে বেলে পাথরে নির্মিত খাজুরাহোর মন্দিরগুলি মূলত বৈষ্ণব, শৈব, সৌর ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের যা চান্দেলা রাজন্যবর্গদের পৃষ্ঠপোষকতার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

পৃথিবীতে কোনো জিনিসকে সঠিক ভাবে জানতে গেলে মানব সমাজের অন্তস্থিত ধর্ম ও দর্শনকে বুঝতে হবে। শাশ্বত ভারতের মূল জীবনী শক্তি এবং সেই জাগ্রত বোধই হলো প্রেম ভালোবাসা। খাজুরাহোর মন্দিরের ভাস্কর্য সেই প্রেমকে ভারতীয় ঐতিহ্যের পরম্পরা রূপে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছে। আনুমানিক ১৩ বর্গকিলোমিটার জুড়ে ব্যাপ্ত এই মন্দিরগুলি ৩ ভাগে বিভক্ত যথা— পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগে, এর মধ্যে পশ্চিমি গোষ্ঠীরই প্রশস্তি সব থেকে বেশি। পশ্চিমি গোষ্ঠীর মন্দিরগুলি হলো কাণ্ডারীয় মহাদেব, লক্ষ্মণ, বিশ্বনাথ, চিত্রগুপ্ত, দেবী জগদম্বা, চৌষট্টি যোগিনী, নন্দী মন্দির, পার্বতী মন্দির, লক্ষ্মী মন্দির, বরাহ ও মাতঙ্গেশ্বর প্রমুখ। খাজুরাহো মন্দিরগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ হলো কাণ্ডারীয়া মহাদেবের মন্দির। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে মহম্মদ বিন কাসেমের নেতৃত্বে মুসলমান সাম্রাজ্যবাদীদের সিন্ধু প্রদেশের আক্রমণের স্রোত সর্বপ্রথম পূর্ণতা লাভ করে গাজনির সুলতান মামুদের দ্বারা সোমনাথ আক্রমণ ও মন্দির ধ্বংসের ক্রমবর্ধমান ধারা, যা ১০১৯ খ্রিস্টাব্দে চান্দেলা রাজ বিদ্যাধর চান্দেলের (১০০৩-১০৩৫) কাছে এসে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় এবং ১০২২ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মামুদ পুনরায় কালিঞ্জর দুর্গ আক্রমণ করে ব্যর্থ হয়। চান্দেলরাজ বিদ্যাধরের সামরিক শক্তির কাছে পরাভুক্ত হয়ে মামুদ সন্ধি করতে বাধ্য হয়। বিদ্যাধর চান্দেল এহেন বিজয়কে চিরস্মরণীয় করে রাখতে নিজের ইষ্টদেব ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন কাণ্ডারিয়া মহাদেবের মন্দির, যা সে যুগের মুসলমান ভাষ্যকার ইবান-অল্-অতহিরের লেখায় পাওয়া যায়। কাজই এই মন্দির শুধু শিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে হিন্দু গরিমার সাক্ষ্য বহন করে না, বরং হিন্দু বীরত্বের ও গৌরবের এক বিজয়গাথাকেও উল্লেখ করে, যা 'A

Vanquished Race has no history' বিখ্যাত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের Tokyo Trial-এর অন্যতম বিশিষ্ট জুড়ি শ্রদ্ধেয় রাধাবিনোদ পালের উক্তির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রূপে আমাদের ইতিহাস চর্চার মধ্যে অবস্থিত। ৩৩.২২ × ১৮.১৪ মিটার জমির ৩৫ মিটার উঁচু শিখরাবিশিষ্ট কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দির খাজুরাহো মন্দিরগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ ও উচ্চতম। কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দিরের শিখর হলো 'আনেকালাক' পদ্ধতির যা বিভিন্ন শৃঙ্গ ও উপশৃঙ্গর দ্বারা মূল শিখরের রেপ্লিকা হয়ে ধাপে ধাপে মূল স্থাপত্যের সঙ্গে একত্রিত হয়ে সমগ্র সৌধটিকে এক সমসত্ত্ব প্রদান করেছে।

যার ফলে সমগ্র কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দিরটি একটি পাহাড় ও অন্ধকার বৃহৎ গহ্বর স্বরূপের এক প্রতিকৃতি বলে মনে হয় অর্থাৎ 'The impression of the Mountain and the Cavern', যা ভগবান শিবের প্রকৃত রূপের ন্যায় মেরু পর্বতের মতন প্রতিভাত হয়। ফলত এই শিবমন্দিরের নামকরণের সার্থকতা, যার ইংরেজি অর্থ—'Temple of the cave Dweller Siva.'

জগতি, মণ্ডপ, অর্ধ-মণ্ডপ, মহা-মণ্ডপ ও শিখর এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত বক্রতাযুক্ত নকশার উপরে দেউড়ি যুক্ত গঠনশৈলীতে নির্মিত চান্দেলা শিল্প সৌন্দর্যের এক অদ্বিতীয় ভাস্কর্যের নিদর্শন হলো এই মন্দির।

পূর্বদিক করে উচ্চ জগতির উপর মন্দিরে দুই পাশে রয়েছে পুরুষের সঙ্গে খেলোয়াড় সুলভ ভঙ্গিতে মুক্ত অবস্থায় দণ্ডায়মান শার্দুল (mythical lion form)। তিনটি প্রশস্ত সিড়ি উঠে এসেছে দেউড়িতে এক অপূর্ব সুন্দর অলঙ্করণে নির্মিত মকর তোরণের প্রবেশের দ্বারা এবং ঢালযুক্ত প্রস্তরের অর্ধমণ্ডপ উন্মোচিত হয়েছে মণ্ডপে। মণ্ডপের প্রবেশপথেও রয়েছে মকর তোরণ, মণ্ডপের প্রদক্ষিণার পথটিও বাতায়ন যুক্ত। মণ্ডপের সিলিং করবেল পদ্ধতিতে নির্মিত, মণ্ডপ ও মণ্ডপের প্রবেশদ্বারে স্তম্ভ ও প্রকোষ্ঠগুলি অপূর্ব বৃক্ষসুন্দরী দ্বারা সজ্জিত। বিভিন্ন দেবদেবী, সুরসুন্দরী, অপ্সরা দেবাঙ্গনা-মিথুন, লতা গুল্ম ইত্যাদি দ্বারা শোভিত মন্দিরের গর্ভগৃহটি কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন। গর্ভগৃহের বেদীতলের উপর শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠিত। দেউড়ির বাতায়নের মধ্যে দিয়ে আলো আঁধার খেলা মন্দিরের মধ্যে খোদিত দেবাঙ্গনা ও মিথুন ভাস্কর্যগুলিকে এক সৌম্য সুন্দরের ভঙ্গি প্রদান করে। মন্দিরের বাহির দেওয়ালগুলি, স্তম্ভগুলিও বিভিন্ন দেবঙ্গনা, শার্দুল ও অলৌকিক উত্তেজক মিথুন মূর্তির দ্বারা শোভিত। এএসআই-এর প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ Alexander Cunningham কাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দিরের মূর্তিগুলির গণনা করেন। মোট ৮৭২টি মূর্তি যুক্ত মন্দিরটির ভিতর রয়েছে ২২৬টি এবং ৬৪৬টি রয়েছে বাইরে।

খাজুরাহো মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্যের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো 'দেবঙ্গনা-মিথুন' ভাস্কর্য। প্রস্তর নির্মিত দেবঙ্গনা মূর্তিগুলির আশ্চর্য চকিত সৌন্দর্য ও সরল উজ্জ্বল গ্রাম্যভাব নির্দ্বিধায় এক মহত্ত্বের দ্যোতক, যা সত্যই দেবাঙ্গনা ভাস্কর্যগুলিকে এক শাশ্বত নারীত্ব প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে। এইখানে শিল্পকলা কেবলমাত্র দৃশ্যমান বস্তু নয়, বরং এক ধারণা শক্তি। খাজুরাহো মন্দিরগাত্রে খোদিত মিথুন ভাস্কর্যগুলি প্রধানত ৪ প্রকার— (১) লাবণ্যময় (graceful couples), (২) আসক্ত (amorous), (৩) মিথুনরত (couples cupulation), (৪) ভ্রষ্ট (couples in perverted sexual postures), প্রাক্‌গুপ্ত ও পরবর্তী মৌর্যযুগে যদিও মিথুনরত যক্ষ-যক্ষী উর্বরতার প্রতীক চিহ্ন রূপে ধর্মীয় বিষয়ে ব্যবহৃত হয়েছিল, তথাপি চতুর্থ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হিন্দু মন্দিরের অলংকরণে মিথুনমূর্তি প্রয়োগের ভাবনা ও তাৎপর্য সম্পূর্ণ পৃথক।

মন্দির অলংকরণে মিথুন মূর্তি প্রয়োগের রহস্য অন্তর্নিহিত রয়েছে সমকালীন সাহিত্য, স্থাপত্য শিল্প ও অনুসারী শিল্পকলায় বর্ণিত সৌন্দর্য বিজ্ঞানের মধ্যে। কারণ এটা ভুললে চলবে না যে সাহিত্য ও শিল্পকলা পরস্পর শুধু সম্পর্ক যুক্ত তা নয়, বরং একে অপরের উপর নির্ভরশীল। কার্যত উভয়েই সমকালীন মনুষ্য জীবনের স্বাদ ও ভাবনা সমানভাবে প্রতিফলিত করে। যে-কোনো যুগের মানুষের মূল্যবোধ, রুচি ইত্যাদি সততার সঙ্গেই উৎকীর্ণ হয় তার সাহিত্যে ও শিল্পকলায়। পার্থক্য শুধুই ব্যক্তিগত সৌন্দর্যবোধের প্রকাশে। ঠিক সেই কারণেই কাব্যের সৌন্দর্য ও রস বৃদ্ধির জন্য যা প্রযোজ্য তা ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। কাজেই সাহিত্যের অধ্যয়নই এই শিল্প ভাস্কর্যের মূল উৎস। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেম সম্বন্ধীয় চিত্র বর্ণনায় সম্ভোগ শৃঙ্গারের ব্যবহার সব চাইতে বেশি কালিদাস (৪০০-৬৫০ এ.ডি.) থেকে শুরু করে পণ্ডিত জগন্নাথের (17th century) কাব্য রচনায় দেখতে পাই। কাজেই এঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল কাব্যের মধ্যে রসভাব সঞ্চারণ করা এবং এই রসবোধের মাধ্যমেই তাঁরা তাঁদের সৌন্দর্যায়নের আনন্দ ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন কাব্যে, যা শিল্পকলায় অনুরূপভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে। কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্রের ন্যায় কপিল বাৎসায়ন রচিত কামশাস্ত্রও তাই হয়ে উঠেছে সমাজ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এক শাস্ত্র যেখানে শুধুই প্রেম-সম্বন্ধীয় বর্ণনা ব্যক্ত হয়নি, Physiology, Medicine, Psychology, Sociology এবং কাম সম্বন্ধীয় নীতিও ব্যক্ত হয়েছে। তাই 'কামশাস্ত্র' 'অর্থশাস্ত্রের' ন্যায় এক শাস্ত্র যা মনুষ্য জীবনের জ্ঞানে ও পূর্ণতার জন্য রচিত। অনুরূপভাবে শিল্প শাস্ত্রে মিথুন ভাস্কর্যের প্রয়োগ সত্যই সৌন্দর্যের কারণে হিন্দু মন্দিরে ব্যবহৃত হয়েছে। খাজুরাহো মন্দিরগাত্রে খোদিত নারী মূর্তিগুলি লীলা অর্থে নাট্য ও বিলাস অর্থে কাম।

মুদ্রাগুলির রস ভঙ্গি নির্মাণে প্রধান স্থপতি/শিল্পীকে বিশেষ নজর দিতে হয়েছে, যাতে সৌন্দর্যায়নের রস সিঞ্চনের ছলে প্রকৃত আনন্দ লাভ হয়। এখানেই অন্তর্নিহিত হয়েছে খাজুরাহোর কাণ্ডারীয় মহাদেব মন্দির নির্মাণের সার্থকতা। ■

বারুইপুরে রাসমেলা

সপ্তর্ষি ঘোষ

দক্ষিণ ২৪ পরগণার এক প্রাচীন বর্ধিষ্ণু জনপদ বারুইপুর। বারুইপুরে প্রতি বছর সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় রাসমেলা। এই মেলা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার গ্রামীণ মেলাগুলির অন্যতম। এবছর রাসমেলা ২২৩ বছরে পদার্পণ করলো। রাস উৎসব মূলত বারুইপুরের প্রাক্তন জমিদার রায়চৌধুরীদের পারিবারিক অনুষ্ঠান হলেও কালক্রমে এই মেলা সর্বজনীন মেলায় রূপান্তরিত হয়েছে।

কীভাবে বারুইপুরের রাসমেলার সূত্রপাত হয়েছিল, সে বিষয়ে একটি সুন্দর লোকশ্রুতি আছে। ১৬১০ খ্রিস্টাব্দে ২৪ পরগণার বারো ভুঁইয়ার প্রধান প্রতাপাদিত্য মোগল সেনাপতি ইসমাইল খাঁর কাছে পরাজিত হবার পর প্রতাপাদিত্যের বহু বীর সৈনিক বর্তমান সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নেন। এদের মধ্যে অন্যতম মদন রায় গঙ্গার তীরে জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রায়মঙ্গল কাব্যে মদন রায়ের নাম পাওয়া যায়। মদন রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শ্রীরাম এই অঞ্চলের জমিদারি চালাতেন। শ্রীরামের অকাল প্রয়াণে তাঁর পুত্র দুর্গাচরণ দীর্ঘদিন জমিদারি চালাবার পর পুত্র কালিশঙ্কর রায়কে দিয়ে যান। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কালিশঙ্করের পুত্র রাজবল্লভ রায় নানা কারণে রাজপুর গ্রাম পরিত্যাগ করে বারুইপুরে জমিদারি পত্তন করেন। জমিদার রাজবল্লভ ছিলেন পরম বৈষ্ণব। তিনি নিজের বাড়িতে রাধামাধবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে নিত্য পূজার্চনা করতেন। এ সময়েই বারুইপুরে রাস উৎসবের সূচনা হয় জমিদার রাজবল্লভ রায়ের উৎসাহ ও উদ্যোগে।

বারুইপুরের মাটি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পাদস্পর্শে ধন্য। সে আর এক কাহিনি। রাসমেলা শুরুর বহু আগে ইংরেজি ১৫১০ সালে শ্রীচৈতন্যদেব শান্তিপুর অদ্বৈত আশ্রম থেকে পদব্রজে আদি গঙ্গার তীর ধরে নীলাচলে যাবার পথে বারুইপুরের আঁটিসারা গ্রামে অনন্ত আচার্যের বাসভবনে একরাত সংকীর্তনে অতিবাহিত করেছিলেন। জমিদার রায়চৌধুরী পরিবারে এর প্রভাব পড়ে। তারা বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। এখনও রায়চৌধুরী পরিবারে প্রাচীন প্রথা বর্তমান।

প্রতি বছর কার্তিক পূর্ণিমার পুণ্য তিথি থেকেই রায়চৌধুরী বাড়ির সম্মুখস্থ 'আট বিঘা ময়দান'-এ রাসমেলা শুরু হয়। রাস পূর্ণিমার শুভলগ্নে বৈদ্যুতিক আলোকসজ্জা এবং আতসবাজির প্রদর্শনীর মাধ্যমে রায়চৌধুরী পরিবারের কুলদেবতা রাধামাধব জিউ ভক্তবৃন্দ দ্বারা পরিবৃত হয়ে রাসমঞ্চে এসে অধিষ্ঠান করেন। তিনদিন ধরে পূজার্চনা চলে। এই সময় স্থানীয় আচার্য ব্রাহ্মণবৃন্দ কীর্তন সহযোগে সারা বারুইপুর শহর প্রদক্ষিণ করেন। বর্তমানে দেবোত্তর মন্দির দেখাশোনার দায়িত্বে আছেন রায়চৌধুরী পরিবার। এবছর পক্ষকালব্যাপী জমজমাট রাসমেলা শুরু হবে ১৫ নভেম্বর থেকে।

(রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে প্রকাশিত)

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে

SIP করুন, উন্নতি করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

২০০০ টাকা প্রতি মাসে যারা ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৫ পর্যন্ত SIP-তে নিয়মিত বিনিয়োগ করেছেন তাদের প্রত্যেকের ফান্ড ভ্যালু বর্তমানে ১.০১ কোটি টাকা, মোট বিনিয়োগ ৪.৮ লাখ টাকা মাত্র।

মিউচুয়াল ফান্ড বিনিয়োগ বাজারের ঝুঁকির শর্তাধীন। যোজনা সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি যত্ন সহকারে পড়ুন।

DRS INVESTMENT

Mutual Fund | Insurance | Fixed Deposit | Bond

কোলকাতা, হাওড়া • Email : drsinvestment@gmail.com

9830372090

9748978406

ব্লু-হোয়েল থেকে সন্তানদের সতর্ক করার দায়িত্ব বাবা-মায়ের

সুতপা বসাক ভড়

কমপিউটার, মোবাইল ইত্যাদিতে ব্লু-হোয়েল খেলাটি সারা বিশ্বের কিশোর-কিশোরীদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। খেলাটি ২০১৩ সালে রাশিয়াতে শুরু হয় এবং আজ পর্যন্ত ১৩০টির বেশি প্রাণ নিয়েছে। বর্তমানে খেলাটি গোটা পৃথিবীর কিশোর-কিশোরীদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেলাটি অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্ম, স্যোশাল মিডিয়া অ্যাপ বা অনলাইন কমিউনিটি মেসেজিং এরিয়াতে খেলা হয়ে থাকে, ফলে এর অ্যাডমিনিসট্রেটরকে ধরা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। খেলাটি ৫০ দিন ধরে চলে এবং এতে অ্যাডমিন খেলোয়াড়কে প্রতিদিন একটি করে টাস্ক দিয়ে থাকে।

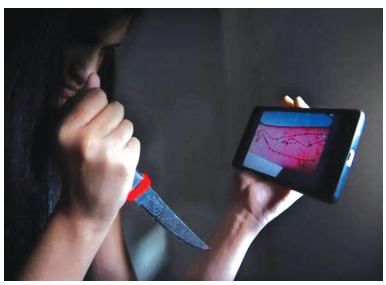

সম্প্রতি মাদুরাইতে ১৯ বছরের এক ছাত্র এর শিকার হয়েছে। সে তার সুইসাইড নোটে লিখেছে যে, ব্লু-হোয়েল শুধু খেলা নয়—একটি বিপদ। এই খেলাটি একবার খেলতে শুরু করলে এর থেকে বাইরে বেরোনো অসম্ভব। সব থেকে সাংঘাতিক তথ্য হল যে, এই খেলাটির ব্যাপারে সব থেকে বেশি অনুসন্ধিৎসু হলো ভারতের ছেলে-মেয়েরা। গত একবছরে তারাই সব থেকে বেশি সংখ্যায় খেলাটির ব্যাপারে সার্চ করেছে। এই খেলাটির ডাউনলোড করার সার্চ-এ ১০০ শতাংশ রেটিং মিলেছে।

দক্ষিণ ভারতের শহরগুলিতে সবথেকে বেশি সার্চ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে কোচি (১০০ শতাংশ) ও তিরুবনন্তপুরমে (৯৭ শতাংশ) সব থেকে বেশি সার্চ রেটিং মিলেছে। এরপর কলকাতা, থানে, নাগপুর, কোয়েম্বাটুর, মুম্বই, গাজিয়াবাদ, গুয়াহাটি এবং সুরাট শীর্ষ দশটি শহরের মধ্যে পড়ছে। বিশ্ব সূচিতে ৩৪ নং পর্যন্ত ভারতের স্থান আছে। ৩৫ নং প্রথম বিদেশি শহর দুবাইয়ের সার্চ পয়েন্ট মাত্র ২৩ শতাংশ।

এই বছর মার্চ মাসে, ব্লু-হোয়েল খেলার ব্যাপারে জানার জন্য ছাড়া ডাউনলোড করে সার্চ করাতেও ১০০ শতাংশ রেটিং মিলেছে। সুইসাইড গেম নামেও খেলাটি সার্চ করা হয়েছে।

এই সার্চ-এর থেকে জানা গেছে যে, এটি বর্তমান প্রজন্মের জন্য কী সাংঘাতিক বিষম পরিস্থিতি তৈরি করেছে। কেরল, তামিলনাড়ু, পশ্চিমবাংলা, মহারাষ্ট্রে খেলাটি অনেক কিশোর- কিশোরীদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

বেশ কয়েকটি রাজ্য সরকার খেলাটি নিষিদ্ধ করেছে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও কারিগরী মন্ত্রালয় গুগুল, ফেসবুক, ইয়াহু-র মতো ইন্টারনেট কোম্পানিগুলিকেও এই খেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা লাগাতে বলেছে। এছাড়া ছোটোদের এই খেলা থেকে দূরে রাখার জন্য মা-বাবাকে তাদের সন্তানদের অনলাইন কাজকর্মের ওপর নজর রাখার পরামর্শ দিয়েছে।

আশার কথা, দুর্ভাগ্যবশত এই খেলায় ঢুকে পড়লেও বেরোবার রাস্তা যে একেবারে বন্ধ তা নয়! সম্প্রতি উত্তরপ্রদেশের বেরিলির সতেরো বছরের শুভম এই খেলা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। প্রথমে শুভম এই খেলাটি খেলবে বলে ডাউনলোড করে। ৪ আগস্ট প্রথম টাস্ক একটি মোবাইল নম্বর থেকে মেসেজের মাধ্যমে আসে। এতে বলা হয় নিজের প্রিয় বন্ধুর উদ্দেশে গালিগালাজ লিখে হাতটা উন্মুক্ত করে ২৪ ঘণ্টা ঘোরাফেরা করতে হবে। টাস্ক পুরো হাবার পরে ৫ আগস্ট তার কাছে শুভকামনা জানিয়ে মেসেজ আসে।

এরপর দ্বিতীয় টাস্ক পায় ৬ আগস্ট। এতে ভোর ৪টে ২০ মিনিটে 'হন্টেড ইন কনেস্টিকট' নামের ভয়ের সিনেমাটি তাকে অনলাইনে দেখানো হয় এবং ভিডিও কলিংয়ের মাধ্যমে শুভমের মুখের ভাবের ওপর নজর রাখা হয়। টাস্ক পুরো করার জন্য ৭ আগস্ট সে শুভকামনা মেসেজ পায়।

তৃতীয় টাস্ক আসে ৮ অগস্ট। এতে বলা হয় ব্লু-হোয়েলের চিত্র বাঁ হাতে ব্লেড দিয়ে বানাতে হবে। শর্ত ছিল লাইভ মুভমেন্ট দেখাতে হবে। এরপরই শুভম মোবাইল সুইচ অফ্ করে দেয়। কিন্তু, ওকে আবার খেলা চালিয়ে যেতে বলার মেসেজ আসতে থাকে। ওকে হুমকি দেওয়া হয় যে, ওর বাড়ির লোকজনের ক্ষতি করা হবে। কিন্তু শুভম আর খেলেনি। খেলাটি থেকে সাইন আউট করা যায় না। শুভম খেলাটি আন-ইনস্টল করে দেয়। যে নম্বর থেকে মেসেজ আসত সেটি ট্রু-কর্নার-এ সার্চ করে জানা গেছে যে, সেটির প্রথম নম্বর ৭—যা রাশিয়ার কোড। ১৫ আগস্ট রাতে মোবাইল রি-সেট করে নেবার পরে আর কোনো মেসেজ আসেনি।

শুভম জানিয়েছে যে, খেলাটি শুরু করলেও বেরিয়ে আসা যায়। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ভয় দেখাবে, কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। সুতরাং, মা-বাবা এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানালে এর থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং আবার সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা যায়।

বিশ্ববাংলায় বিশ্বফুটবল

'হুকোমুখো হ্যাংলো বাড়ি তার বাংলা'— কথাটা খেয়ালখোলা 'আবোল তাবোল' সংগ্রহে সুকুমার রায় লিখেছিলেন। আজ হঠাৎ বিশ্ববাংলার আবির্ভাবে তার কী নবরূপ হতে পারে, তাই ভেবে অনেকেই অস্থির। কেননা এই হুঁকোমুখো হ্যাংলার বিশ্বায়নে বিশ্বহ্যাংলা হবে, না বাংলার ভুবনায়নে বিশ্ববাংলা, সে বিষয়ে একটা ধন্দ ছিল বটে, কিন্তু বিশ্বকাপের অনুষ্ঠান বিশ্ববাংলায় হওয়ায় তার সহজ সমাধানসূত্র মিলে গেল।

বিশ্ববাংলায় বিশ্বকাপ লাভে বিশ্বহ্যাংলামি যে শেষ পর্যন্ত সাফল্যের সহিত পরাজয় বরণ করে, সারণির শেষধাপে অবস্থান নিশ্চিত করার গৌরব অর্জন করেছে, তা নিয়ে আমাদের গর্বের শেষ নেই। বিশ্বকাপে এই বিশ্বপরাজয়ের গৌরব নিয়ে আমাদের কোনও সমস্যা নেই, না হয়, আসছে বছর আবার হবে। কিন্তু সমস্যা হলো, বিশ্বরূপে বাংলার অনুধাবনে।

কথাটা অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরে বাজারে চলছে এবং হন্যে হয়ে তার অর্থ হদিশ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কিছুতেই কিনারা করতে পারিনি। বাংলার কবি লিখেছিলেন, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি' কিন্তু তিনি তো কোথাও বিশ্ববাংলার কথা ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেননি। আর এক কবি, 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল', লিখেছেন এবং তিনি বিশ্বকবি, কিন্তু তাঁর লেখাতে বিশ্বতত্ত্বের হদিশ মিললেও, কোথাও বিশ্ববাংলার দেখা মেলেনি। পরম পরিতাপের কথা, তিনি বাংলার এই নবসৃষ্টির ভুবনায়ন দেখে যেতে পারেননি বটে কিন্তু তার জন্যে ট্রাফিক সিগন্যালে তাঁর বসন্তের গান বর্ষায় উৎকট হয়ে বাজতে কোনও বাধা হয়নি।

আমরা জানি নবসৃষ্টি সব সময়ই নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার দান। বাল্মীকির মনোভূমিই যেমন রামের জন্মভূমি, তেমনি উদ্ভট কাব্যের সৃষ্টি বহুমুখী প্রতিভার কোনও উদ্ভট কবির মনোভূমিতে। কোনও কবি আবার যুগের আগে জন্মগ্রহণ করেন, ফলে তাঁর সৃষ্টির মহিমা বুঝতে হয়তো এক যুগ কেটে যায়। কিন্তু মানুষের জীবন তো সীমাবদ্ধ। তাই 'কালোহ্যয়ং নিরবধি' বলে ভবভূতি সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন, তবে আমাদের যে মেয়াদ ফুরায়ে যায় মা। তাই এঁড়েচুয়ালদের মতো জেদ ধরে বসলুম, বিশ্ববাংলার ঝালাপালার একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়বো না।

তখন মনে হলো, বঙ্গভাণ্ডারের রত্নসম্ভারে সমৃদ্ধ বিশিষ্ট বাংলা আকাদেমির দ্বারস্থ হলে বোধহয় একটা সুরাহা মিলতে পারে। কেননা সেই একশো বছর আগে থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীর নেতৃত্বে যে বাংলা অভিধান রচনা শুরু হয়েছিল, অর্থ ও উচ্চারণ স্থিরীকরণে, তা নব অবতারে বাংলা আকাদেমিতে অতি উৎসাহে চললেও কিন্তু এখনও সামান্য সামান্য বানানের কোনও স্থিরীকৃত রূপ স্থির করতে পণ্ডিতদের কালঘাম ছুটে গেল। আরে বুঝতে হবে, চলিষ্ণু বলেই এর নাম জগৎ, এবং জগৎ যেমন চলিষ্ণু, জগতের সমস্যাও তেমনি চলিষ্ণু। বিজ্ঞানে একদা ফতোয়া দিল, অ্যাটম সমস্যার সমাধান হয়েছে অবিভাজ্য বলে। পরে দেখা গেল, না, না, বিভাজনে নতুন সমস্যা, হিরোসিমা, নাগাসাকিতে বীভৎসভাবে দৃশ্যমান। সুতরাং সমস্যার সমাধান বোধহয় এক অলীক বস্তু, কবির কথায় শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে।

কিন্তু 'ধন্য আশা কুহকিনী', আশা মরেও কিছুতেই মরে না। তাই মনে হলো, বাংলা আকাদেমি তো বিদ্বজ্জনসভা এবং আড্ডাপ্রিয় বাঙালির একটি মহতী আড্ডাসভা, সেখানে হয়তো আমার এই ধন্দের উত্তর মিললেও মিলতে পারে। হা হতোস্মি, দেখি সেখানে আমার প্রশ্ন শোনারই কোনও অবকাশ নেই, তার আবার উত্তর! আসলে এটি একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান, সব কিছুই থ্রু প্রপার চ্যানেল চলে। আমার যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে যথাযোগ্য স্থানে পেশ করলে, সেটির সারবত্তা বিচারে কলকে না পেলে, তা পাশের লেকে সলিলসমাধি লাভ করবে।

তাছাড়া উদ্ভবের পর থেকে আকাদেমির অলিখিত নিয়ম হলো, কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। আগে কর্তা ছিলেন মহা-ইন্টেলেকচুয়াল কোটেশন মাস্টার। আর এখন হয়েছেন মহা-কালচারাল কোটেশন কুট্টি। এবং কে না জানে, কর্তা হলেই তাঁর মধ্যে পাণ্ডিত্য গজগজ করতে বাধ্য। সেই সংস্কৃত আপ্তবাক্য অনুযায়ী— মূকং করোতি বাচালং। সেই বাচালতার ধাক্কায় বিস্মরণ ঘটে যায়, আর একটি আপ্তবাক্য, মূর্খ তাবচ্চ শোভতে যাবৎ ন ভাষতে, যা প্রায়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মহাভারত লিখন পর্বে শুনেছি, গণেশের কলম থামাতে ব্যাসদেব মাঝে মাঝে কূটশ্লোক রচনা করতেন যার অর্থ সহজবোধ্য হতো না। আমাদের শাস্ত্রেও শুনি এমন সব বাক্য আছে যার শব্দার্থ, ব্যঙ্গার্থ, রূঢ়ার্থ, যোগরূঢ়ার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তেমনি 'বিশ্ববাংলা' শব্দটি যত সহজ মনে হচ্ছে এটি তত সহজ নয়। তাই একবার বিশ্ব, আর একবার বাংলাকে শব্দার্থ, ব্যঙ্গার্থ, গূঢ়ার্থ ও যোগরূঢ়ার্থ, নানাভাবে কাটা-ছেঁড়া করে হতাশ হয়ে দেখি, তেলে আর জলে কিছুতেই মিশ খায় না। বিশ্বও ঠিক আছে, বাংলাও ঠিক আছে, কিন্তু বিশ্ববাংলা হয়ে জোড় খেলেই দেখি বিপদ, তার রহস্য দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে।

বিশ্ব কথাটায় না হয় একটু বিশ্ব বিশ্ব ভাব আছে; যেমন বিশ্বনাগরিক বলতে বোঝায় যায়, জগৎ জুড়িয়া এক জাতি আছে সে জাতির নাম মানবজাতি। তেমনি বিশ্ববাংলা বলতে কী বোঝায়, জগৎ জুড়িয়া এক দেশ আছে সে দেশের নাম বিশ্ববাংলা। তাহলে আর কবির কথার কী গতি হবে, ''কোন দেশেতে তরুলতা

সকল দেশের চাইতে শ্যামল, কোন দেশেতে চলতে গেলে দলতে হয় রে দুর্বাকোমল... সে আমাদের বাংলাদেশ আমাদেরই বাংলা রে।"

এইখানে আবার একটি কাজিয়া উপস্থিত, বাংলাদেশ বলতে তো যাকে এখন ইংরেজিতে বলে ব্যাংলাডেশ। আগে ছিল বঙ্গদেশ, পদ্মাপারে তার অংশ পূর্ববঙ্গ, হিন্দুদের অত্যাচারের মুক্তিতে হলো পূর্ব পাকিস্তান, তারপরে মুসলমানদের অত্যাচারমুক্ত হয়ে হলো বাংলাদেশ, বাঙালিদের স্বাধীন, সার্বভৌম, একমাত্র রাষ্ট্র বাঙালিস্তান। বিশ্বে বাংলার ও বাঙালির নাকি একমাত্র প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, কিন্তু বাংলাদেশের শহিদরাই বুকের রক্ত দিয়ে বাংলাভাষাকে বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসরূপে বরণীয় করে তুলেছেন। এবং তাঁরাই নাকি বিশ্বে বাঙালির বর্তমানে একমাত্র আশাভরসা।

এ বিষয়ে বাংলাদেশিরা তো বটেই, এমনকী পূর্ববঙ্গ-তাড়িত পশ্চিমবঙ্গবাসীদেরও কোনও দ্বিমত নেই। কারণ এই বিশিষ্ট বঙ্গপুঙ্গবরা, 'যঃ পলায়তি স জীবতি' করে বাঁচলেও প্রতিফলিত গৌরবে বিগলিতপ্রাণ হয়ে, আমাগো বাংলা বলে ঘন ঘন মূর্ছা যান। এখানকার নিরাপদ দূরত্বে থেকে পলাতকা হিয়া মনীষীরা পূর্বভাগেই বাঙালিপ্রাণের নতুন পরিচয় ঘটবে এবং বিশ্বে বাঙালির পরিচয় তুলে ধরবে সে বিষয়ে স্থির নিশ্চয়। সেইসব শুনেই বোধহয় ওপারের বন্ধুরা বলেন, দাদা আপনারা সব হিন্দি হইয়া গেসেন। আমি বলি, ঠিক কথা, আমরা হিন্দি ছিলুম, হিন্দি আছি এবং তোমাদেরও ভাই বেরাদররা যখন বিদেশে গিয়ে হোটেল খোলে, তখনও কিন্তু আদর্শ হিন্দি হোটেলেরই নামে, বাংলাকে পাত্তা না দিয়ে। তা হোক, দেশে জয় বাংলা, বিশ্বেও জয় বাংলা। এরই মধ্যে হঠাৎ বিশ্ববাংলা আহ্বান শুনে চক্ষু চড়কগাছ। কী হলো, খুড়োর কলের খুড়ো একদিন গুংগা বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল, এও দেখি সেই অবস্থা। একদিন মহাওঙ্কার ধ্বনির মতো এক মহাকবির মুখ থেকে বিশ্ববাংলা শব্দটি উদ্গীত হলো আর একটা শিয়ালের রবের সঙ্গে সব শিয়ালের এক রা-এর শৃগালি ঐকতানের মতো চারিদিক বিশ্ববাংলা মুখরিত হয়ে উঠলো। আমাদের রাজ্যের নাম তো পশ্চিমবঙ্গ, সেটির বদলে নানামুনির নানা মতের পরে শেষে সেটাই কি বিশ্ববাংলারূপে আবির্ভূত? তাহলে বালাদেশের বিশ্বজয়ের কী হবে গা।

বঙ্গভূখণ্ড একদিন উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবধি বিস্তৃত ছিল, কিন্তু নানা খণ্ডে বিভক্ত, যার একটি অংশের নাম ছিল বঙ্গ। তার মধ্যে সপ্তম শতাব্দীতে গৌড়রাজ শশাঙ্কের আমল থেকে পাল, সেন জমানার দীর্ঘ সময় এবং সুতলানি আমলে শ্রীচৈতন্যের আমল পর্যন্ত গৌড়ীয় সভ্যতার উজ্জ্বলতা ছিল সুবিস্তৃত। মোগল আমলের শেষ দিকে সুজা প্রথম ঢাকাভিত্তিক সুবে বাংলার প্রচলন করেন এবং ইতিমধ্যে পূর্ব মাগধী থেকে যে আঞ্চলিক ভাষার উদ্ভব হয় তার নাম হয় বাংলা। ব্রিটিশরা এসে তারই ওপরে তকমা লাগায় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি এবং গৌড় হয় ইতিহাস। সেই থেকে 'মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে, আমরা বাঙালি বাস করি সেই তীর্থ বরদবঙ্গে', প্রসিদ্ধ হলো।

কিন্তু সে সুখ বেশিদিন রইলো না। ব্রিটিশদের স্বার্থে প্রথম হলো বঙ্গভঙ্গ ও তার পরে বিভাজনের রাজনীতির চূড়ান্ত অবস্থায় ভঙ্গবঙ্গ। এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গে ভরা এবং নতুন রঙ্গ হলো বিশ্ববাংলা। এখন পোষ্য চারণকবিদের মুখে মুখে এই অর্থহীন শব্দের অবোধ উচ্চারণে বিশ্ববাংলা, কান ঝালাপালা করে তুলেছে। একবার ফিদা হোসেন সাহেবের ছবি দেখতে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম, আজ্ঞে এই ছবিটার মানে কী! তিনি বললেন, ছবি দেখতে হয়, মানে খোঁজা বৃথা। কতকগুলি শব্দ আছে যার অর্থ নেই কেবল ব্যঞ্জনা আছে এবং যে যত না বুঝবে ততই তার জন্যে লাফাবে। তাকেই বলে গড্ডলিকাপ্রবাহ।

মনে পড়ে গেল, চার্লি চ্যাপলিনের একটি ছবির কথা। কারখানার ভোঁ বাজলো, শ্রমিকরা ঠেলাঠেলি করে কাজ করতে ঢুকলো। পরেই একপাল ভেড়া একইরকমভাবে গাদাগাদি করে মেষপালকের ডান্ডার তালে চলতে লাগলো। এ সম্বন্ধে সবচেয়ে সত্য কথা বলেছে, রাজশেখর বসুর 'গড্ডলিকা' বইয়ে 'সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড' গল্পের গণ্ডেরিরাম বাটপাড়িয়া। শেয়ারের ফাটকা বাজার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, কবীরজিকা বচন শুনিয়ে— ঐসী গতি সনসারমে গাড়র কি ঠাট। অর্থাৎ সংসারে ভেড়ার পালের নিয়ম হলো, একটা ভেড়া যদি কোনও গর্তে পড়ে তাহলে সকলেই সেই একই রাস্তা ধরে। বিশ্ববাংলাতেও দেখি অতি বুদ্ধিমান মানুষদের মধ্যেও তা বিরল নয়, যদি সামনে গাজর ঝোলানো থাকে। অবশ্য কী ধর্মে কর্মে আর কী রাজনীতিতে প্রশ্নহীন আনুগত্যই তোফা লাভের সেরা রাস্তা।

শাসনক্ষমতায় গেলে যে ক্ষণে ক্ষণে কবিত্বের বেগ ওঠে, সেকথা সত্যি। বাংলাদেশে মিলিটারি প্রেসিডেন্ট এরশাদের কবিতা রোজ কাগজে বেরোত। কিন্তু গণআন্দোলনে তাঁর রাজত্বও গেল, কবিতা সুন্দরীও অদৃশ্য হলেন। আমাদের এখানে মসনদে বসার পর কবি নাট্যকারের সৃজনপ্রতিভা উত্তাল হয়ে উঠল। তারপরে রাজপাটে হারিয়ে অফুরন্ত অবসরে হারানো রাজত্বের কাঁদুনি গাওয়া ছাড়া তাঁর কণ্ঠে আর কোনও গীত নেই। বর্তমান কবিজমানায় আবার হঠাৎ সত্যজিৎ ধরণী থেকে স্টেশনের অদ্ভুত নামকরণে, মহানায়ক উত্তমকুমার, হরেক কিসিমের কবিতা, ছড়া, গান প্রভৃতি বানের জলে ভেসে যাচ্ছে। এবং ভজনলালদের বাহবা বাহবা নন্দলালের গদ গদ গীতে গগন অন্ধকার। একদিন শুনেছি 'বিশ্ববীণারবে বিশ্বজন মোহিছে', এখন শুনছি বিশ্ববাংলা রবে সবুজ বাংলা মোহিছে।

তবে সেদিন কলকাতা বিমানবন্দরে গিয়ে যেন এতদিনে আমার বোধিসত্ত্বের মতো বোধোদয় হলো। কথায় বলে, বৃক্ষ তোমার নাম কী, না ফলেন পরিচীয়তে। সুজাতার পরমান্নের মতো, বেয়ারার হাতে কফি স্যান্ডউইচ খেয়ে বেরোতেই দেখি, সামনে জ্বলজ্বল করছে 'বিশ্ববাংলা'— একটা নানান কিসিমের দোকান। দোকান তো বুঝলুম, কিন্তু সেই বিশ্ববাংলায় কী করে বিশ্বকাপ খেলা হয়, সেকথা ভেবে দিশেহারা। আরে বুদ্ধু, যে দোকানে আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ পাওয়া যায় সেখানে কিছুই অসম্ভব নয়! আর লিপিপুটের দেশে তো সবই সম্ভব।

সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকার উপায়

সরোজ কুমার ভড়

কোনো কাজ শুরু করার আগে সেই কাজের জন্য বিশেষরূপে প্রস্তুতি দরকার হয়। যেমন ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, কাবাডি, খো-খো খেলা, সাঁতার, দৌড়, কুস্তি ইত্যাদির জন্য বিশেষ বিশেষ প্রক্রিয়াযুক্ত প্রস্তুতি ব্যায়াম দরকার, তেমনি প্রাণায়াম করার আগেও দরকার হয়। যদি কোমরে, পায়ে, হাতে যন্ত্রণা না থাকে বা শারীরিক সক্ষমতা থাক্‌লে প্রাণায়ামের আগে যৌগিক জগিং, সূর্যনমস্কার, ডন-বৈঠক ইত্যাদি করে নিতে হয়। তারপর বিধিপূর্বক প্রাণায়াম শুরু করতে হয়। প্রত্যেক প্রাণায়ামের পরে পরেই পায়ের, কোমরের, পিঠের, হাতের, মাথার কিছু কিছু সুক্ষ্ম ব্যায়াম করে নেওয়া দরকার। সুক্ষ্ম ব্যায়ামের সময় দুই নাক দিয়ে লম্বা শ্বাস নেওয়া ও ছাড়া দরকার। প্রাণায়াম হয়ে যাওয়ার পর কতকগুলি যোগাসন অবশ্যই করা দরকার। প্রায় চুরাশি লক্ষ আসন আছে। এর মধ্যে চুরাশি হাজার আসন করা যায়। তার মধ্যে চুরাশিটি আসন সাধারণত করা হয়ে থাকে। স্কুল কলেজে পনেরো–কুড়িটি আসন শেখানো হয়ে থাকে কিন্তু রোগ অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষকে মাত্র পাঁচ-ছয়টি আসন করলেই চলে। তবে অনেক বেশি রোগ থাকলে তাকে তো কয়েকটি আসন বেশি করতেই হবে। মনে রাখতে হবে, কোমরের যন্ত্রণা থাকলে সামনের দিকে ঝুঁকে কোনো কিছু করা যাবে না আর হার্টের সমস্যা বা হারনিয়ার সমস্যা থাকলে পিছনের দিকে শরীর বাঁকানো যাবে না। শ্বাসের ব্যাপারে মনে রাখতে হবে, নীচের দিকে কোনো কিছু করলে শ্বাস ছাড়তে হয় এবং উপরের ক্ষেত্রে শ্বাস নিতে হয়।

একজন সুস্থ মানুষ, ছোট ছেলে বা মেয়ে যদি মনে করে তার খেলাধুলার জায়াগার অভাব বা সময়ের অভাব তাহলে সে যোগ প্রাণায়াম আসনের মাধ্যমে সারাজীবন সুস্থ থাকতে পারবে। আবার তার কিন্তু প্রাণায়ামের জন্য বেশি সময় দরকারও নেই, তার জন্য প্রাণায়ামের ধরনও আলাদা। তারজন্য পূর্ণ প্যাকেজ হল— (১) যৌগিক জগিং, (২) ডন-বৈঠক, (৩) সূর্য নমস্কার, (৪) প্রাণায়াম, (৫) সুক্ষ্ম ব্যায়াম ও (৬) কয়েকটি আসন। এক্ষেত্রে প্রাণায়ামের ধরন হল দ্রুতগতিতে প্রত্যেকটি প্রাণায়াম করা

এবং প্রত্যেকটি প্রাণায়ামই তিন থেকে পাঁচ মিনিট করে করা। আসনের মধ্যে বজ্রাসন, মণ্ডুকাসন, শশকাসন, গোমুখাসন, বক্রাসন বা অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন, মকরাসন, পবন মুক্তাসন, ভূজঙ্গাসন, শলভাসন, মর্কটাসন, পাদবৃত্তাসন, দ্বিচক্রিকাসন, সিংহাসন, সর্বাঙ্গাসন, হলাসন বা মৎস্যাসন, শীর্ষাসন, শবাসন ইত্যাদির থেকে কয়েকটি অভ্যাস করতে হবে। পারলে সবকয়টিই এক একদিন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে অভ্যাস করতে হবে।

খাওয়াদাওয়া ঃ সাধারণভাবে বলা যায় যে যোগ-প্রাণায়াম যাঁরা করবেন তাঁদের কোনরকম নেশা না করাই ভাল। ঊষাপান অর্থাৎ সকালে খালিপেটে এক-দুই গ্লাস জল খাওয়া দরকার। সারাদিনে চার-পাঁচ লিটার জল পান করতে হবে। জল চুমুক দিয়ে এবং বসে বসে খাওয়া দরকার। টিফিন বা ভর পেটে খাওয়ার একঘণ্টা পরে জল খাওয়া ভাল। সকালে ছোলা, বাদাম, সোয়াবিন্, গম, মেথি ইত্যাদি অঙ্কুরিত করে খেতে হবে। টিফিনেও অঙ্কুরিত জিনিসগুলি, মুড়ি, চিঁড়েভাজা, আটার তৈরি নড়ুল, দিব্যপেয়, আটার রুটি, ছাতু মেখে অথবা ঘোল করে খাওয়া যায়। দুপুরে সাধারণ ডাল–ভাত, শাক-সব্‌জি, ঘি, টকদই খাওয়া যায়। টক দইয়ের সঙ্গে চালের দানার মতো এক টুকরো খাবার চুন খাওয়া ভাল। বিকেলের দিকে কিছু ফল, ছানা ইত্যাদি খাওয়া যায়। রাত্রিতে ন'টার মধ্যে খাওয়া শেষ করা ভাল। রাত্রিতে দু-তিনটি আটার রুটি, সঙ্গে দু-চার মুঠো খই, সবজি, ডাল, পারলে চার-ছটি বাদাম, একগ্লাস দুধ সামান্য চিনি দিয়ে গরম করে খাওয়া যায়।

কিন্তু যদি বিভিন্ন রকমের রোগ থাকে তাহলে তাদের জন্য প্রাণায়ামের মাত্রা যেমন ভিন্ন, তেমনি খাওয়া দাওয়ার নিয়মও ভিন্ন অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কিছু খাওয়া যাবে না। আবার বিশেষ বিশেষ অনেক কিছু খেতেও হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—সুগার বেশি থাকলে ভাত, আলু, মিষ্টি, রুটি গোরুর দুধ, বিট, গাজর ইত্যাদি খাওয়া যাবে না। যা খেতে হবে তা হল ডালিয়া, অঙ্কুরিত মেথি-মুগ-গম, করলা, করলার রস, পদ্মগোলঞ্চের রস, শসা, সাদা নয়নতারা পাতা ও ফুলের রস, নিমপাতার রস, ডবলটোন্ দুধের টক্ দই ও ছানা। চর্মরোগ থাকলে দুধ, দুধ থেকে তৈরি যেকোনো মিষ্টি, লবণ, দুধের সাঙ্গে লবণ, না খাওয়াই ভালো। তেঁতো বেশি করে খাওয়া দরকার। মোটাভাব থাকলে ওজন কমাবার জন্য গোধন অর্ক, গরমজল, ত্রিফলাচূর্ণ-মধু-পাতিলেবুর রস গরম জলে গুলে, লাউয়ের রস গরম করে গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে মিশিয়ে খেতে হয়। ভাত, মিষ্টি, আলু, লবণ ইত্যাদি না খাওয়াই ভাল। আবার খুব পাতলা বা রোগা চেহারা হলে ভাত, মিষ্টি, আলু, রুটি, ফল, দুধ, ছানা খাওয়া যায়। দুধের সঙ্গে শুকনো খেজুর কিংবা কিশ্‌মিশ্ ফুটিয়ে খান। দুইবেলা টিফিনের সঙ্গে পাকা কাঁঠালি কলা খাওয়া দরকার। ইউরিক অ্যাসিড্ বেশি থাকলে মুগডাল, মুগকড়াই ছাড়া কোনরকম ডাল খাওয়া যায় না। টমাটো, বাঁধাকপি, পালং ইত্যাদি না খাওয়াই ভাল। মেথি গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, আদার শুঁট্‌গুড়ো মিশিয়ে রেখে তার থেকে এক চামচ নিয়ে সামান্য গরম জলে মিশিয়ে দুই বেলা খালি পেটে খেতে হয়।

U-17 WORLD CUP
INDIA 2017

নিঃস্ব দেশের সফল বিশ্বকাপ সংগঠন

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারত আর একবার প্রমাণ করল যে সে বিশ্বক্রীড়া শরীরচর্চা বৃত্তে নিঃস্ব হলে কী হবে, যে কোনও আন্তর্জাতিক মানের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সফলভাবে আয়োজন করার ক্ষেত্রে পাওয়ার হাউসদের থেকে কোনও অংশে পিছিয়ে নেই। এর আগে ১৯৮২-র এশিয়াড ও ২০১০-র কমনওয়েলথ গেমস আয়োজন করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট মুন্সীয়ানা দেখিয়ে বিশ্ববাসীর কাছে প্রশংসিত হয়েছেন এদেশের ক্রীড়া সংগঠক ও প্রশাসকরা। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে যদি আসল কাজের জায়গা অর্থাৎ খেলাও শরীরচর্চার ক্ষেত্রেও যদি এই দক্ষতার পরিচয় দিতে পারতেন অ্যাথলিট ও ব্যায়ামবিদরা, তাহলে বোধহয় ভারতকে আর উপহাসের পাত্র হয়ে থাকতে হতো না বিশ্বসমাজে। স্বাধীনতার পর সাত দশক কেটে গেছে, এখনও এশিয়াস্তরেই ভারত চীন, জাপান, কোরিয়া ইরান, কাজাখাস্থানের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। বিশ্ব সংসার তো অনেক বড় ব্যাপার। এই প্রতিবেদনের বস্তুতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট দেশের মাটিতে হয়ে চলা প্রথম ফিফা যুব বিশ্বকাপের আসর।

১৮ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে অনূর্ধ ১৭ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য ভারতীয় দলের পিছনে। গত দুবছরে ১৭টি দেশে গিয়ে প্রস্তুতি নিয়েছে ও ম্যাচ খেলেছে। বিদেশি কোচ, ট্রেনার, সাপোর্ট স্টাফ নিয়ে এসেও যদি এই ফল হয়, তাহলে দেশীয় কোচেরা কেন ব্রাত্য থাকবে ফেডারেশনের কাছে। একমাত্র চিরিচ মিলোভান ছাড়া কোন বিদেশি কোচের প্রশিক্ষণে ভারত আন্তর্জাতিক মানের বড়মাপের টুর্নামেন্টে মোটামুটি চলনসই পারফরমেন্স মেলে ধরতে পেরেছে? সাম্প্রতিককালে বব হাউটন কিছুটা সাফল্য এনে দিয়েছেন অন্তত এশিয় পর্যায়ের টুর্নামেন্টে। এই বিশ্বকাপে একমাত্র কলম্বিয়া ম্যাচ ছাড়া আমেরিকা, ঘানার বিরুদ্ধে ম্যাচে স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে ভারতীয় ফুটবলাররা। আর এই লজ্জাজনক ফলের জন্য পর্তুগীজ কোচের গোয়ার্তুমিও খানিকটা দায়ী। যে কোমল খাতাল আমেরিকার বিরুদ্ধে ভাল খেলল, তাকে বাকি দুটো ম্যাচে খেলানোই হলো না। কোচ মাতোসের স্ট্রাটেজি ট্যাকটিক্সও খেলার গতি-প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিসূচক ছিল না। একমাত্র গোলকিপার ধীরাজ, স্টপার আনোয়ার আলিই টুর্নামেন্টের প্রাপ্তি, যারা পরে বিদেশের বড় ক্লাবে খেলতে পারে। তবে ফেডারেশনের উচিত এদের সুনীল ছেত্রীর সিনিয়র টিমের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে নিয়মিত আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলানো, তাতে তারা এবং ভারতীয় ফুটবলও লাভবান হবে।

যুব বিশ্বকাপ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল বড়দের বিশ্বকাপের গুণগতমান ও উৎকর্ষের প্রায় তুল্যমূল্য অবস্থানে তারা চলে এসেছে। এই বিশ্বকাপে বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে দেখা গেছে যারা এখনই নিজের দেশের হয়ে সিনিয়র বিশ্বকাপ খেলতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের টিমোথি উইয়া, জোস সার্জেন্ট, ফ্রান্সের আদিল গুইরি, ইয়াসিন আদলি, স্পেনের মোহামেদ আগমির (থোপ) ইংল্যান্ডের জাডন স্যাঞ্চো, কালাম হাডসন, ব্রাজিলের লিঙ্কন, পাওলিনহো, ইরাকের মহম্মদ দাউদ এই বয়সেই পরিণতবোধ, সৃজনধর্মী উৎকর্ষ সর্বোপরি আধুনিক বিশ্ব ফুটবলের উপযোগী টেকনিক স্কিল, পাওয়ার ও টেম্পারমেন্ট প্রদর্শন করেছেন, তা চোখ খুলে দিয়েছে ভারতবর্ষের ফুটবলপ্রেমীদের। বিশ্বকাপ শেষ হয়ে যাবার পর অন্তত কয়েকমাস ফুটবলপ্রেমীরা এদের খেলার স্মৃতি রোমন্থন করবেন বলা যায়। ইংল্যান্ডের চিরাচরিত পাওয়ারফুল লং-বল ফুটবল থেকে বেরিয়ে এসে যে নানন্দিক, দৃষ্টিনন্দন খেলা মেলে ধরেছে বাচ্চা ছেলেরা তা মনের খোরাক ও চোখের আরাম। এই টিমটার ভবিষ্যত উজ্জ্বল, ব্রিটিশ

ফুটবলের নবজাগরণও ঘটবে এদের হাত ধরে। একই কথা প্রযোজ্য স্পেনের সম্পর্কে।

এক সময়ে ব্রাজিলে স্ট্রিট ও বিচ ফুটবলের দৌলতে হাজারো প্রতিভাবান ফুটবলার উঠে আসত যারা সেলেকাওদের বছরের পর বছর বিশ্বফুটবলে কাজ করেছে। এখন সেই ধারাটি দেখা যাচ্ছে স্পেনের ফুটবলে। প্রতিভার ছড়াছড়ি যেন স্পেনীয় ফুটবলে। জাভি, তোরেস, দাভিদ ভিয়ার মতো জিনিয়াসরা সরে গেলেও বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়নি তাদের। পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি ব্যাটন তুলে নেওয়ার জন্য। এই যুব ফুটবল দলটি থেকে আবিল রুইস, মোহা, গোমেজ, মিরান্দা ইতিমধ্যে স্পেনের বড় বড় ক্লাবগুলো থেকে অফার পেয়ে গেছে। বিশ্বখ্যাত ক্লাবের হয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী

'লালিগরি' ম্যাচ খেলে এরা অচিরেই শাণিত ও পরিশীলিত হয়ে উঠবে। তারপর স্পেনের জাতীয় দলে ঢুকে বিশ্ব ফুটবলে স্প্যানিশ আর্মাডা ছুটিয়ে বেড়াবে। ইউরোপ, লাতিন আমেরিকার অনন্ত ঐতিহ্য ও গৌরবের যথেষ্ট সপ্রতিভ খেলা মেলে ধরে যুব বিশ্বকাপের মান ও মাত্রাকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে এশিয়ার ইরান, ইরাক, জানান, আফ্রিকার ঘানা, মালি, নাইজার। মালি আফ্রিকার চ্যাম্পিয়ন হিসেবে খেলতে এসে ভুলিয়ে দিয়েছে নাইজিয়া, ক্যামেরুন, দক্ষিণ আফ্রিকার অনুপস্থিতিকে।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

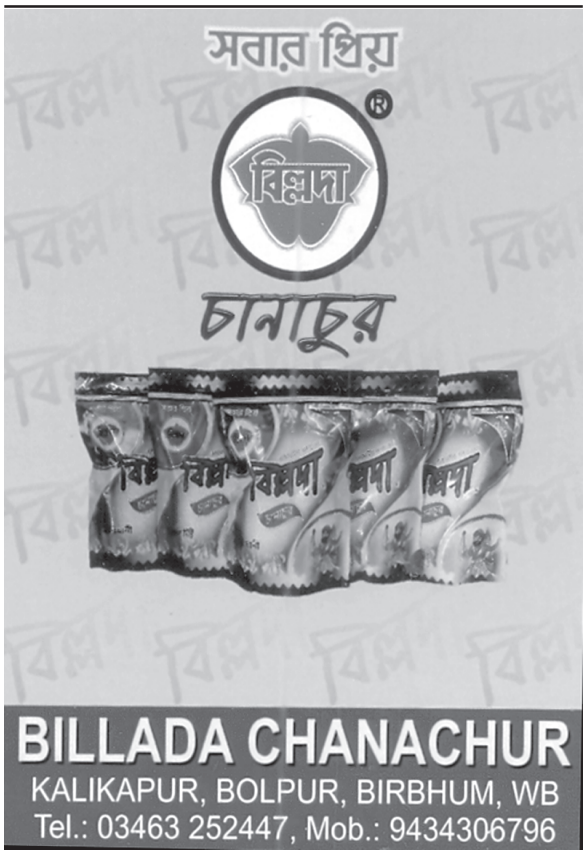

রবীন্দ্রনাথ, বনমালী ও ভদ্রমহিলা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত একজন কাজের লোক ছিলেন। নাম বনমালী। রবীন্দ্রনাথকে বাবামশাই বলে ডাকতেন বনমালী। একদিন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে এক ভদ্রমহিলা এলেন। বনমালী তাকে বসতে বললেন। ভদ্রমহিলা বনমালীকে জিজ্ঞেস করলেন—কবিগুরু কি বাড়িতে নেই?

বনমালী বললেন— না, স্নান করছেন।

রবীন্দ্রনাথের স্নান চলাকালীন বনমালীর সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ কথা হলো ভদ্রমহিলার। ভদ্রমহিলা খুব আগ্রহ নিয়ে বনমালীকে জিজ্ঞেস করলেন— কবিগুরুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীরকম? কথাবার্তা বলেন আপনার সঙ্গে? বনমালী কিছুটা আক্ষেপের সঙ্গে বললেন— না, বাবামশাই আমার সঙ্গে খুব একটা কথা বলেন না। কোনো কাজ করতেও বলেন না। আমি নিজে থেকেই বুঝি ওনার কখন কী লাগবে।

ভদ্রমহিলা বেশ অবাক হয়ে বললেন— উনি আপনাকে নিজের প্রয়োজনে ডাকেন না?

বনমালী বললেন— লেখালেখি করার সময় ডাকেন। ভদ্রমহিলার আগ্রহের শেষ নেই, প্রশ্ন করলেন— কী বলে ডাকেন?

বনমালী বললেন— বনমালী চাকর বলে ডাকেন।

ভদ্রমহিলা ভুল শুনলেন কী না তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য প্রশ্ন করলেন— বনমালী চাকর? উনি আপনাকে বনমালী চাকর বলেন?

বনমালী হ্যাঁ সূচক সম্মতি প্রকাশ করে মাথা নাড়লেন। ভদ্রমহিলা খুব হতাশ হলেন। এত বড় একজন কবি কীভাবে একজন গৃহকর্মীকে চাকর বলতে পারেন? রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা এতো নীচু?

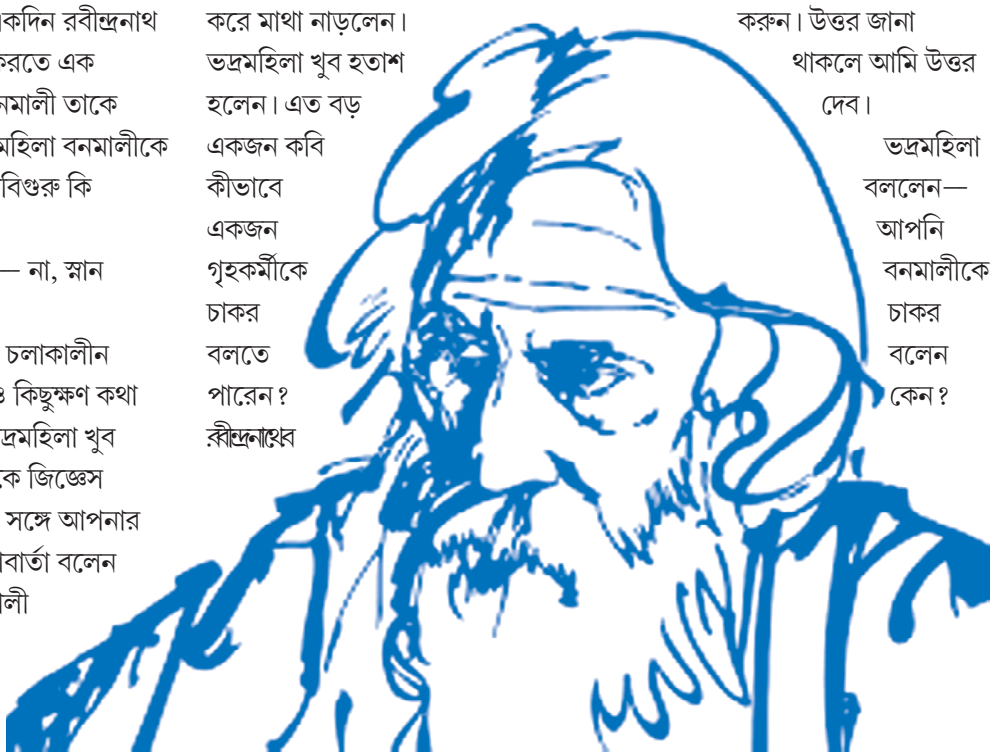

ভদ্রমহিলা যখন এরকম ভাবছেন রবীন্দ্রনাথ চলে এলেন। ভদ্রমহিলার ইচ্ছে ছিল কবিগুরুর পায়ে হাত রেখে প্রণাম করবেন, কিন্তু সেই ইচ্ছেটা আর জীবিত নেই।

রবীন্দ্রনাথ ভদ্রমহিলাকে বললেন— দুঃখিত, আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি। ভালো আছেন? আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?

ভদ্রমহিলা বললেন— আসতে কোনো অসুবিধা হয়নি, আশা করি যেতেও কোনো অসুবিধা হবে না। আমি আপনাকে বিরক্ত করবো না। শুধু একটা প্রশ্ন করবো আপনাকে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন— হ্যাঁ করুন। উত্তর জানা থাকলে আমি উত্তর দেব।

ভদ্রমহিলা বললেন— আপনি বনমালীকে চাকর বলেন কেন?

রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন শুনে হাসতে লাগলেন। ভদ্রমহিলা বিরক্ত হয়ে বললেন— না হেসে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি বনমালীকে চাকর বলেন কেন?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাসি থামিয়ে বললেন— চা খেতে ইচ্ছে করলে আমি তাকে 'চা কর' বলবো না? সে খুব ভালো চা বানায়। খাবেন আপনি?

ভদ্রমহিলা কিছুটা বিব্রত বোধ করলেন, খানিকটা লজ্জাও পেলেন। রবীন্দ্রনাথ গলার স্বর সামান্য উঁচু করে বললেন— বনমালী, চা কর।

সংগৃহীত

ভারতের পথে পথে

কামাখ্যা

প্রাচীন কিরাত জনজাতির উপাস্য দেবী কামাখ্যা। অসমের গুয়াহাটির কাছে এই মন্দির অবস্থিত। ৫১ সতীপীঠের একটি এই কামাখ্যা। জনশ্রুতি অনুসারে কালাপাহাড় এই মন্দির ধ্বংস করেছিল। তবে ঐতিহাসিক প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় আলাউদ্দিন হুসেন শাহ কামতা রাজ্য আক্রমণের সময় এই মন্দির ধ্বংস করে। পরবর্তীকালে কোচবিহারের কোচ রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় মন্দিরটির পুনর্নির্মাণ হয়। এই মন্দিরে কোনো মূর্তি নেই। গ্রীষ্মকালে অম্বুবাচী উপলক্ষে এখানে বিশাল মেলা অনুষ্ঠিত হয়। কামাখ্যা মন্দিরের চত্বরে রয়েছে দশমহাবিদ্যার মন্দির। কালিকা পুরাণ মতে দেবী এখানে শিবের সঙ্গে বিহার করেন।

এসো সংস্কৃত শিখি

দৈবেচ্ছা তথা আসীত্, কিং কুর্মঃ ?
ঈশ্বরের ইচ্ছা, আমরা কী করব?
অহম্ অন্যদ্ উক্তবান ভবান্
আমি অন্য বললাম, তুমি অন্য
অন্যদ্ গৃহীতবান্।
কিছু বুঝলে।
এতাবদ্ অসত্যং বদতি হতি
এত মিথ্যা কথা বলে এ আমি
অহং ন জাতবান্।
জানতাম না।

ভালো কথা

পূজা পরিক্রমা

কালীপুজো হয়ে গেল। আলো, আতসবাজির খেলা চলে এই সময়। কিন্তু আমরা কেউ খেয়াল রাখি না এই আলোর রোশনাই ও আতসবাজি প্রকৃতির কত ক্ষতি করে। সমস্ত আতসবাজি ক্ষতিকর নয় ঠিকই, তবে বেশিরভাগই তাই, পরিবেশকে দূষিত করে। তাই সবার উচিত পরিবেশবান্ধব বাজি ব্যবহার করা, যা পরিবেশের কোনো ক্ষতি করবে না। বেশি আওয়াজের শব্দবাজিও ব্যবহার করা উচিত নয়। তাতে মানুষের, পশুপাখির খুব ক্ষতি হয়। বিশেষ করে বয়স্ক, অসুস্থ ও শিশুদের। অমাবস্যার রাতে আলোর ঝলকানিতে পাখিরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই কালীপুজোর রাতে সবার কথা মাথায় রেখে আমাদের আতসবাজির ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা তা মানি না। আইন ভঙ্গ করি। সুনাগরিক হিসেবে আমাদের কর্তব্য দেশের আইনকে মান্য করা।

রঞ্জিৎ সিংহ, লেক টাউন, কলকাতা।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

ছোটদের কলমে

জঙ্গলে একদিন

নীলাঞ্জন পাল, নবম শ্রেণী

শহর ছেড়ে বহু দূরে
গাছগাছালির নিভৃতে
হট্টগোলের গণ্ডি ছেড়ে
চলে গেলাম জঙ্গলে।

শান্ত নদী পাখির ডাক
বন্যপ্রাণীর আপন পথ
মাথার উপর নীল আকাশ
মনের কোণে বেঁচে থাক।

এই বিভাগে ছোটরা কবিতা লিখে পাঠাও

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। রাসবিহারী বসু।। ৩৮

অবশেষে ১৯৪৩ সালের ৪ জুলাই সিঙ্গাপুরে এক বিশাল সমাবেশে—

১৯৪৫ সালের ১৯ জানুয়ারি রাসবিহারী বসুর মৃত্যু হয়। সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন— পূর্ব এশিয়ায় ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তিনি হলেন জনক।

সমাপ্ত

শব্দরূপ-৮৪০ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১	২		৩	■	৪		৫
■		■	৬			■	
■	৭		■	■		■	■
৮		■	৯	১০		■	১১
	■	১২			■	১৩	
■	■		■	■	১৪		■
১৫	■	১৬		১৭	■		■
১৮			■	১৯			

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** বাউলের বাদ্যযন্ত্র, **৪.** দাঁড়িপাল্লা, **৬.** মহোৎসব (বৈষ্ণবের), **৭.** বিষ্ণুর দশম অবতার, **৮.** এটা পাকলে কাকের কী? **৯.** পুরাণোক্ত মুনি যাঁর অস্থিতে বজ্র নির্মিত হইয়াছিল, **১২.** তালু, জিহ্বার ঊর্ধ্বদেশ, **১৩.** কুস্তিগির, **১৪.** 'বল —, বল উন্নত মম শির' (নজরুল), **১৬.** তাজা, নতুন, **১৮.** একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র পতঙ্গ, **১৯.** যার কাছে কিছু চাহিলেই পাওয়া যায়।

উপর-নীচ : **২.** হেসে খলখল গেয়ে — তালে তালে দিব তালি' (রবীন্দ্র), **৩.** রঘুপরতি রাঘব রাজা —', **৪.** তলবাবাদক, **৫.** শিশুদের ভয় দেখাবার জন্য কল্পিত জীব, **৮.** ভারতের প্রাচীনতম শাস্ত্র, **৯.** গভীর পঙ্ক; (ব্যঙ্গে) আকস্মিক দুরবস্থা, **১০.** যে নায়িকা স্পষ্ট ক্রোধ না দেখিয়ে ব্যঙ্গোক্তি করে, **১১.** মনসা পাতার তুল্য ফলাবিশিষ্ট বর্শা বিশেষ, **১২.** অনটন, অভাব, **১৩.** হরিদবর্ণ মণিবিশেষ, পান্না, **১৫.** 'সাধের — বানাইল মোরে বৈরাগী', **১৭.** বায়স।

সমাধান : শব্দরূপ-৮৩৮

■	■	ম	হা	শ্বে	তা	দে	বী
ধা	ব	ক	■	ত	■	■	ভা
র	■	র	■	সা	জ	ঘ	র
ক	ল	কে	■	র	ব	■	■
■	■	ত	ট	■	র	জ	নী
ম	হা	ন	স	■	জ	■	হা
হে	■	■	ট	■	ব	হ	র
শ	ক	টে	স	ম্ভা	র	■	■

সঠিক উত্তরদাতা

সঞ্জয় পাল, সাহাপুর, মালদা
সুশীল কয়াল, তাঁতিবেড়িয়া, হাওড়া

□ ৮৪০ সংখ্যার সমাধান পরের সংখ্যায়।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. KOL RMS/048/2016-18
30 October - 2017 - Rs. 10.00,

Published and Printed by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6.
Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. ।। দাম ১০্ টাকা।।